কার্তিক, ১৩৮৩

আনন্দমেলা

দেবজ্যোতি
ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

BCCM-32-75 BEN

আনন্দমেলা

কবিতা ও ছড়া	নজরুল । প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫
	ছোটনের যুক্তি । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৩
	ছড়া । অনির্বাণ রায় ৪০
গল্প	রামযাত্রা । হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৬
	মৌমাছি মৌমাছি । সুধাংশু ঘোষ ১১
বিশেষ রচনা	পশুপাখির সঙ্গে শরৎচন্দ্র । অরবিন্দ গুহ ৪৫
উপন্যাস	সবুজ দ্বীপের রাজা । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০
	মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৩
লেখাপড়া	নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩০
	কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৩১
	হিউম্যানিটিজে ফার্স্ট জয়ন্তীর কথা শোনো ২৫
কমিক্স	টারজান ১৪, ১৫, ১৮, ১৯
	টিনটিন বোম্বেটে জাহাজ ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩
	ডাইনোসর-চুরি ২৮, গাবলু ৩২
পুরাণের কথা	মহাপ্রলয়ের গল্প । অমিতা চক্রবর্তী ১৭
খেলাধুলো	টেবল টেনিসের পাঠশালা । স্পাইকার ৪৮
	ভারতের দুই দৌড়বাজ । পুষ্পেন সরকার ৫০
	দুই ক্লাব, দুই জার্সি । বজ্রসেন ৫২
অন্যান্য লেখা	শব্দ-সন্ধান ১০, মণিমেলার খবর ১০
	বানাও । পূর্ণেন্দু পত্রী ১৬
	আঁকো । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
	শেখো । কারিগর ২৬
	ধাঁধা ২৭, আচ্ছা বলো তো ২৭
	ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ৩৭
	মাসটা কার্তিক । দিদিমণি ৩৭
	ভাবতে পারো ৪০, বড়দের কথা ৪০
	মজার পড়া । কুম্ভক ৪১
	ম্যাজিক ৪৪, বিজ্ঞান-বিচিত্রা ৪৪
	আমাদের কলকাতা ৪৭
	তোমাদের পাতা ৫৪

সূচীপত্র

অলংকরণ
এবারকার প্রচ্ছদ-চিত্রটি তুলেছেন দেবীপ্রসাদ সিংহ। চারের পাতায় কবি নজরুল ইসলামের ছবিটি সোনা চৌধুরীর তোলা।

মাছি মৌমাছি' ও 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'র ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র; 'নজরুল' কবিতার ছবি এঁকেছেন র্ণেন্দু পত্রী; 'ছোটনের যুক্তি'র ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার; 'রামযাত্রা' ও 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র ছবি এঁকেছেন মদন সরকার; 'মহাপ্রলয়ের গল্প' ও 'ছড়া'র ছবি এঁকেছেন অসিত পাল।

দ্বিতীয় বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
কার্তিক ১৩৮৩
অকটোবর ১৯৭৬
দেড় টাকা

সম্পাদক
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল :
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

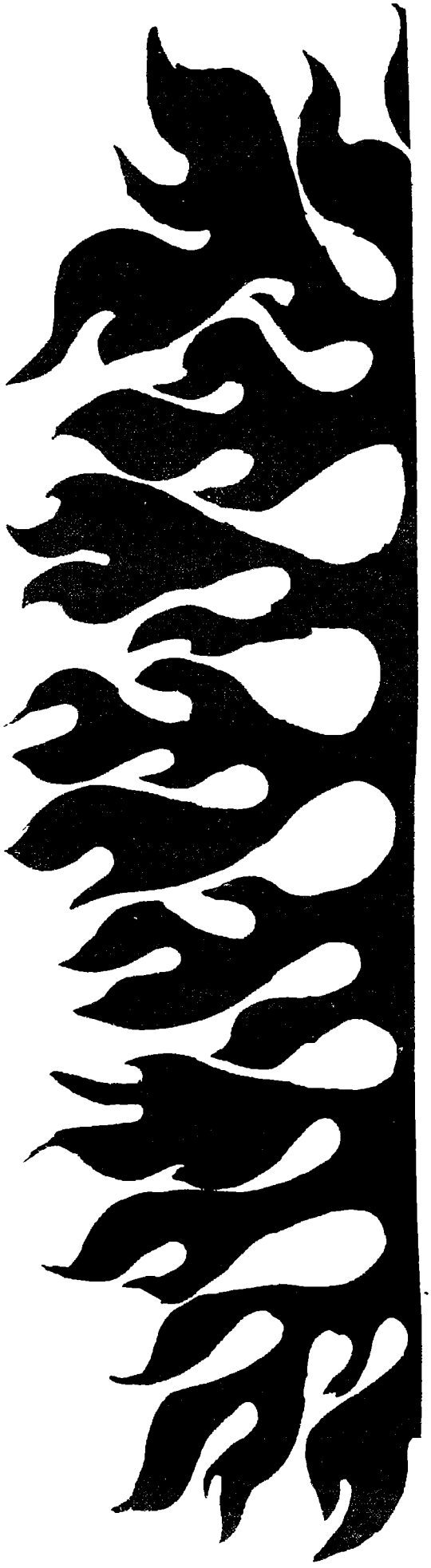

নজরুল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একটা তুফান,
উল্কা একটা,
আরেক বুঝি তারার দেশের ফুল,
একদিন এই তিনের হঠাৎ
হল কি পথ ভুল?
তিনে মিলে যুক্তি করে
তাই হল নজরুল?

নামটাই তার নজরুল, সে
নয় মোটে এক জনা।
তার মধ্যে তিন শরিকের
কোথায় বনিবনা?

ফুল বলে যে, বিলিয়ে সুবাস
ফুটে থাকতে চাই।
তুফান বলে, সামনে যা পাই
ভেঙে দিয়েই যাই।
উল্কা বলে, জ্বালিয়ে জ্বলে
নিজেই হব ছাই!

নজরুল তাই ফুল ফোটাল
প্রাণ-মাতানো গানে,
তুফান-মন্ত্র দিল দেশের
মুক্তি-সেনার কানে,
উল্কা হয়ে জ্বলল নিজেই
নিজের বেগের টানে।

সেই নজরুল নেই কে বলে?
একেবারে ভুল!
বাংলা ভাষায় তিনে এক সে
উল্কা, তুফান, ফুল!

রামযাত্রা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেক দরজায় তিলক এক কথা বলল।

আর দুটো টাকা দিন মা, তাহলেই রামযাত্রাটা নামিয়ে দিতে পারি। এ পাড়ায় তো কখনও কিছু হয় না। একেবারে নতুন ধরনের পালা মা। দিন দুটো টাকা।

তিলক এ পাড়ার বস্তিতে থাকে। বাবুদের মোটর ধোয়, সকলের ফাইফরমাস খাটে, একটা পেট, যা পায় তাতেই চলে যায়। পাড়ার মাতব্বরি করে।

দু-টাকা দু-টাকা করে প্রায় দেড়শো টাকা উঠল। শনিবার বিকাল থেকে রাস্তা জুড়ে মেরাপ বাঁধা শুরু হল।

চলাফেরার একটু অসুবিধা, তবে এ শহরে এ অসুবিধা কেউ গায়ে মাখে না। রাত আটটায় যাত্রা আরম্ভ, ছটা থেকে আসর উপচে পড়ার যোগাড়। পাড়ার কোন ঝি বিকালে কাজে এল না। সেজেগুজে আসরে বসল।

ভদ্রমহিলার সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা পিছনে চেয়ারে বসলেন।

আটটায় আরম্ভ হবার কথা, সাড়ে-আটটা বাজল, সীন ওঠার নাম নেই। তিলক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

পাড়ার সুজনবাবু তাকে পাকড়াও করলেন, কী হল তিলক? সাড়ে আটটা যে বেজে গেল।

তিলক কপাল চাপড়াল, আর বলবেন না বাবু। আজ কৈকেয়ীর পালাজ্বরের দিন তা কি জানা ছিল। কয়েক গ্রেন কুইনিন অবশ্য দিয়েছি। জ্বর ছাড়বার মুখে, তবে বলছে কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

তিলক দাঁড়াল না। ছুটে স্টেজের মধ্যে ঢুকে গেল।

নটায় কনসার্ট শুরু হল। কনসার্ট মানে বাঁশি আর হারমোনিয়াম। দুটোর সুর দুদিকে। পাড়ার ছেলেরাই বোধহয় বাজাচ্ছে। সীন উঠল। রাজপ্রাসাদ, অবশ্য বুঝে নিতে হবে। জরাজীর্ণ অবস্থা। খালি দুটো থাম দেখা যাচ্ছে।

কৈকেয়ী আর মন্থরা। মন্থরার পিঠে কুঁজ থাকবার কথা, কিন্তু মন্থরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কুঁজ লাগালে দশ টাকা বেশি দিতে হবে। কাজেই কুঁজ লাগানো সম্ভব হয়নি।

কৈকেয়ীর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। এখনও জ্বর রয়েছে। সে স্টেজের ওপর বসে পড়ে পার্ট বলতে আরম্ভ করল।

মন্থরা, জানিস তো দশরথের কাছে আমার তিনটে বর পাওনা। এক বরে ভরত রাজা হবে, দ্বিতীয় বরে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হবে, আর তিন নম্বর বরে কী হবে কিছুতেই মনে আসছে না।

মন্থরার চোখমুখের ভাব সুবিধার নয়। দৃষ্টি উদাস। কী ভাবছে ভগবান জানেন।

সে কৈকেয়ীর দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বলল, কেন, ভুলে

গেলে? তিন নম্বর বরে রাম আমাকে বিয়ে করবে।

ভদ্রদর্শকের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। এ আবার কী কথা? এমন কথা তো রামায়ণে নেই।

দু একজন বোঝাল, আজকাল নতুনভাবে রামায়ণের ভাষ্য তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া সূর্পণখা যদি লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চাইতে পারে, তাহলে মন্থরাই বা রামকে বিয়ে করতে চাইবে না কেন?

মন্থরার কথা কৈকেয়ীর বিশেষ কানে গেল মনে হল না। কুইনিনের তেজে তখনও তার দুকান বন্ধ।

বোধ হয় উল্টোই শুনল।

খেপে উঠে বলল, কী, এত বড় তোর আস্পর্ধা? তুই আমার বাপের বাড়ির দাসী, আর আমার কথার ওপর কথা। আমি বলছি ভরত রাজা হবে, আর তুই বলছিস, রাম বড়, রাম রাজা হবে। তোকে আজই দূর করে দেব।

মন্থরা নাকি কানে কিছু শোনে না।

দূর করে দেব, কথাটা কিন্তু ঠিক কানে গেল।

মন্থরা বসে ছিল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

দূর করে দিবি? তুই দূর করে দেবার কেরে? তিলক হাতে পায়ে ধরে এনেছে, তাই এসেছি।

মন্থরা আর বলবার অবকাশ পেল না। কৈকেয়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল।

তবে রে, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

দুজনে ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যেতেই যবনিকা ফেলে দেওয়া হল।

দর্শকদের হাসি আর থামে না।

লজ্জায় তিলক বাইরে বের হতে পারল না।

আধঘণ্টা পর সীন উঠল। দশরথ আর রাম। দুজনকেই বেশ মানিয়েছে। দশরথ সিংহাসনে বসে। সিংহাসন মানে টুলের ওপর রঙীন কাপড় ঢাকা দেওয়া।

বৎস রাম, এবার আমার ইচ্ছা তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি বাণপ্রস্থ নেব। মন্ত্রীকে ডেকে তার আয়োজন করতে বলছি।

দশরথের গলাটা খুব চেনা চেনা ঠেকল। কথা বলার ভঙ্গীও। একটু পরেই চেনা গেল তার সংলাপে।

আমি অভিষেকের আয়োজন করতে শুরু করে দিয়েছি। গৌড়ের প্রজারা ইতিমধ্যেই আড়াই হাজার কিলো আলু এনে গুদামে জমা করেছে। আলু ছাড়া যে-কোনও অনুষ্ঠান অচল। আলুর দম, বাঁধাকপি-আলুর তরকারি, আলুর চপ, আলু ভাজা।

আরো কতক্ষণ আলুর কীর্তন চলত কে জানে। বোধ হয় ভিতর থেকে প্রম্পটর ধমক দিতে দশরথ থেমে গেল।

তবে দশরথকে দর্শকদের সবাই চিনতে পারল।

পাড়ার বাজারের আলুওয়ালা। বিরাট ঝাঁকা নিয়ে যে বাজারে ঢোকবার মুখেই বসে থাকে।

দশরথের সময়ে যে কিলোর যুগ হয়নি, সেটা বেমালুম ভুলে গেছে।

এবার রামের পালা। রাম দশরথের কাছে এগিয়ে এসে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, পিতা, এই বয়সে আপনি বাণপ্রস্থ নেবেন, এ আমি কী করে সহ্য করব। আপনি সহস্র বছর সুখে রাজত্ব করুন। আমি আপনার পদসেবা করে ধন্য হই।

এর মধ্যে রাম বেশ ভালই পার্ট বলল। মিষ্টি গলা, গলায় জোর আছে।

সামনে বসা ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল।

দশরথ দেখল রাম খুব জমিয়ে নিয়েছে। তাই গলায় আবেগ দিয়ে বলতে শুরু করল, বৎস, পৃথিবীর এই নিয়ম। শুকনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়। পুরনো আলু শেষ হলে নতুন আলু ওঠে, তেমনি জোয়ানদের জন্য রাস্তা করে দেবার জন্য আমাদের মতন বুড়োদের সরে যেতে হয়।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দশরথ আলুর কথা ঠিক বলবে।

তুমি অরাজী হয়ো না বাপ।

এইখানে দশরথ কেলেঙ্কারি করল। তার শালগাছের মত ভারি একটা হাত রামের কাঁধের ওপর রাখল। সজোরে।

ব্যাস, রাম চিৎকার করে বসে পড়ল।

ওঃ, তোমাকে না বলেছি কাঁধে একটা ফোড়া আছে। গায়ে হাত দেবে না। আঃ, রক্ত বের হতে আরম্ভ হয়েছে। দুত্তোর, যাত্রা। এই রইল তোমাদের চুল, আর পোশাক। তোমাকে বাইরে পেলে দেখে নেব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রাম মাথার পরচুলা স্টেজের ওপর আছড়ে ফেলল। পোশাক টান মেরে খুলে দিল।

পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি। দেখা গেল, কাঁধের কাছটা রক্তে লাল

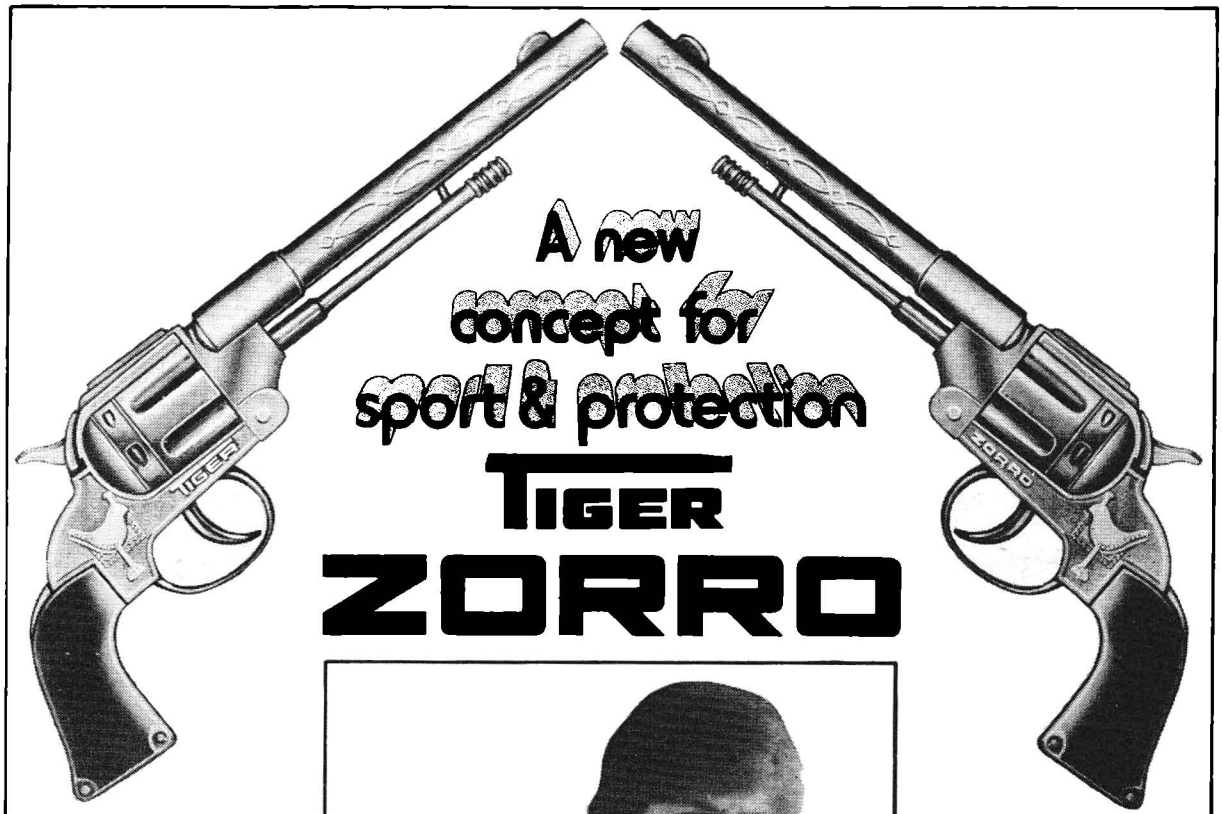

A new concept for sport & protection
TIGER
ZORRO
TIGER
ZORRO
AUTOMATIC REVOLVER
IN BRIGHT CHROME AND
GUN BLACK
50 SHOTS FREE
ATTRACTIVELY PACKED.
FOR TRADE ENQUIRIES
TIGER HARDWARE AND TOOLS LTD.
MARRIS ROAD, ALIGARH Tel : 3742, Gram : Anchor
INTERADS
Tick the appropriate box ☐✓
☐ Please send me a ZORRO AUTOMATIC REVOLVER by V.P.P. I will pay the postman Rs. 45/- inclusive of packing and postage.
☐ Please send a ZORRO AUTOMATIC REVOLVER giftwrapped, with my compliments to
NAME. . .
ADDRESS. . .
(Attach Money Order receipt of Rs. 45,- only)
Cut along dotted lines and mail it to
TIGER TOOLS AND HARDWARE LTD.
Marris Road, Aligarh, U.P.
AM

হয়ে গেছে। তার মানে শ্রীরামচন্দ্রের ফোড়াটা ফেটে গেছে।

দশরথ চাপা গলায় কী বলার চেষ্টা করল, কিন্তু রাম তখন প্রলয় নাচ শুরু করেছে। কোন কথা শুনতে রাজী নয়।

ভিতর থেকে কতকগুলো লোক বেরিয়ে রামকে ঘিরে মঞ্চের মধ্যে নিয়ে গেল। তার মধ্যে তিলকও ছিল।

এদিক দিয়ে কৈকেয়ী মঞ্চে প্রবেশ করল।

হে রাজন, আপনার কাছে দাসীর নিবেদন ছিল।

কৈকেয়ী শাড়ি পালটেছে। মুখেও নতুন করে রং মেখেছে। দুকানে ঝকঝকে দুল।

রামের ব্যবহারে দশরথ খুবই মুহ্যমান। এমন ছেলেকে বনবাসে পাঠাতে তিনি এখনই রাজী। এতবড় সাহস, বাপকে বলে বাইরে গেলে দেখে নেবে।

দশরথ কৈকেয়ীর দিকে চোখ ফেরাল।

কৈকেয়ী সুযোগ বুঝে ইনিয়ে-বিনিয়ে তিনটে বরের কথা নিবেদন করল।

রামায়ণের দশরথের মূর্ছা যাবার কথা, কিন্তু এ দশরথ যেন খুশি হল। বিড় বিড় করে বলল, বনে পাঠালে ঠিক শাস্তি হবে না। আলুর চাষের সময় যখন মাটি খোঁড়া হয়, তখন অমন ছেলেকে পুঁতে মাটি চাপা দেওয়া উচিত।

ভাগ্য ভাল, বিড়-বিড় করে বলার জন্য কথাগুলো দর্শকদের কানে গেল না।

কৈকেয়ী পাকা অভিনেত্রী। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল—মহারাজ, রামকে ডেকে তাহলে বনবাসের আজ্ঞা দিয়ে দিন।

দশরথ ইঙ্গিতটা বুঝল। হুঙ্কার ছাড়ল।

কে আছ, রামকে পাঠিয়ে দাও।

রাম ঢুকতেই সারা আসরে হাসির তুফান ছুটল।

মাথায় ছোট, বহরে বড়, অমাবস্যার রং, ইয়া প্যকানো গোঁফ হৃষ্টপুষ্ট রামচন্দ্র গটগট করে ঢুকল।

বোঝা গেল আগের রাম নামতে রাজী হয়নি। নতুন লোককে পাকড়াও করে নামানো হয়েছে। লোকটিকেও চেনা গেল। মোড়ের রায়বাবুদের চাকর পাঁচু।

সে লজ্জায় দর্শকদের দিকে একেবারে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

কৈকেয়ী বলল, তোমার পিতার আদেশ শোন রামচন্দ্র।

দশরথ উঠে দাঁড়াল। চোখে একটা হাত চাপা দিয়ে বলল, তোমাকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাস দিলাম। এখনই চলে যাও।

রামকে বোধ হয় বলা ছিল, সে একদম কথা বলবে না। মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু রংচং-এ পোশাক পরে, জোরালো আলোর সামনে তার সব গোলমাল হয়ে গেল। কিংবা ঘুরে দাঁড়াতেই সামনে চেয়ারে-বসা রায়বাবুর দিকে বোধ হয় চোখ পড়েছিল।

রাম দুটো হাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর রেখে বাপকে বলল:

হুট করে যাও বললেই তো আর যাওয়া যায় না। বাবুকে বলতে হবে, গিন্নীমার হুকুম নিতে হবে, মাইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আরও কী সব বলছিল, লোকের তুমুল হাসিতে সব চাপা পড়ে গেল।

এবারেও যবনিকা ফেলে দিয়ে মান বাঁচাতে হল।

ইতিমধ্যেই বারো আনা লোক উঠতে আরম্ভ করেছেন। পিছন দিক প্রায় খালি।

সবাই ভাবল এবার বোধ হয় যাত্রা বন্ধ হবে। অবশ্য আধুনিক যাত্রা। সীন ফেলার ব্যাপার রয়েছে। চারদিক খোলা আসর নয়, তিনদিক ঢাকা।

কিন্তু লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা এদের দেখাই গেল না। অথচ পয়সা দিয়ে এদের আনা হয়েছে।

মিনিট পনের। হট্টগোল একটু কমতেই সীন উঠল।

এ-সীনে কারও কোন কথা নেই। রাম, সীতা আর লক্ষ্মণ বনবাসে চলেছে। সীতাকে কোথা থেকে যোগাড় করা হয়েছে কে জানে। সে লম্বায় রামের কোমর পর্যন্ত। একদিক থেকে ঢুকে আর-একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

তাতেও বিপত্তি।

তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে সীতার পায়ের সঙ্গে লক্ষ্মণের পা বেধে আর একটু হলেই দুজনে উল্টে পড়ত।

কোনরকমে সামলে নিয়ে তিনজনে প্রস্থান করল।

এবারে শেষ দৃশ্য।

মন্থরার লাঞ্ছনা। ভরতের হাতে।

ভরত ঢুকতেই সব লোক হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালি আর থামতেই চায় না। এত উচ্ছ্বাসের কারণ ভরত সেজেছে তিলক।

বোধহয় আসল ভরত যাত্রার ব্যাপার দেখে পালিয়েছে, মান রাখতে তিলক নেমেছে ভরতের সাজে, কিংবা তিলকই ভরত সেজেছে গোড়া থেকে।

মন্থরা স্টেজের মাঝখানে বসে ছিল দুপা ছড়িয়ে, ভরত লম্ফঝম্ফ করে ঢুকল।

নীচ দাসী, তোর কুমতলবে দাদা রাম বনবাসে গিয়েছে, আজ আর তোর নিস্তার নেই।

মন্থরার ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা কাটি নিয়ে নির্বিকারচিত্তে কান চুলকাচ্ছে।

এবার ভরত একটু বাড়াবাড়ি করল।

মন্থরার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, আজ তোকে যমালয়ে পাঠাব।

ব্যস, মন্থরা স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল।

খোঁপা খুলে চুল পিঠের ওপর। দুটো চোখ রক্তবর্ণ। মুখে যেন খই ফুটছে।

তবে রে, তোর এত বড় সাহস, তুই আহ্লাদীর গায়ে হাত দিস। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

তিলক একটু থতমত খেয়ে গেল। এসব কথা বইতে নেই। বইতে আছে, মন্থরা ভয় পাবে, কাঁদবে, হাত যোড় করে বলবে রাজকুমার, ক্ষমা কর। আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। এমন কাজ কখনও করব না। কিন্তু তার বদলে এ-মন্থরা তো লাফাচ্ছে।

ভরত একবার শেষ চেষ্টা করল।

গলা বাড়িয়ে বলল, পাপীয়সী, এখনও নাকে খত দে, নইলে তোর শেষ।

ভরত নাগালের মধ্যে যেতেই মন্থরা তাকে জাপটে ধরল। তারপর ধোপা যেভাবে কাপড় আছড়ায়, সেভাবে ভরতের দেহটা স্টেজে আছড়াতে আছড়াতে বলল, আয়, কে কাকে শেষ করে দেখি।

তারপর ধপধপ শব্দ আর ভরতের আর্তনাদ।

লোকেরা স্টেজে উঠে কোনরকমে মন্থরার কবল থেকে ভরতকে ছাড়িয়ে নিল।

ব্যস, যাত্রা শেষ। পরে পাড়ার বৌঝিরা বলেছে, ও তিলক, এ রামযাত্রা না গঙ্গাযাত্রা?

তিলক কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে, ও দুটোর কোনটাই নয় মা। এ হল ভরতের গঙ্গাযাত্রা।

শব্দ-সন্ধান

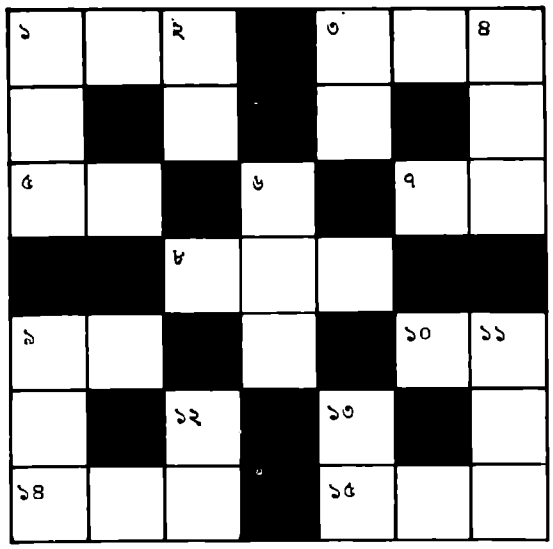

গত সংখ্যায় ছিল 'ঐতিহাসিক' শব্দ-সন্ধান। এই সংখ্যায়, তার বদলে, 'ভৌগোলিক' শব্দ-সন্ধানের ব্যবস্থা করেছি। ভূগোল-বই যারা ভাল করে পড়েছ, চটপট তারা শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারবে।

সংকেত (পাশাপাশি) (১) গঙ্গার পাশে বড় শহর। (৩) ডেনমার্কের বাসিন্দা, তবে পুরোপুরি নয়। (৫) ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ। (৭) ভারতবর্ষের একটি তীর্থক্ষেত্র। (৮) এশীয় দেশের রাজধানী। (৯) রুশী শহর, তেলের জন্য প্রসিদ্ধ। (১০) আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজধানী। (১৪) উল্টোপাল্টে আফ্রিকার উপজাতি। (১৫) ভেনিসে গেলে দেখতে পাবে।

সংকেত (উপর-নীচে) (১) দেশও বটে, খালও বটে। (২) ওলটালে আফ্রিকার একটি দেশ। (৩) ভারতবর্ষের রাজধানী। (৪) নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী। (৬) ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। (৯) পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। (১১) আফ্রিকার একটি বড় শহর। (১২) হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে প্রাচীন শহর। (১৩) ইউরোপীয় দেশের রাজধানী (উচ্চারণটা কি ভুল হল?)

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

গতবারের সমাধান

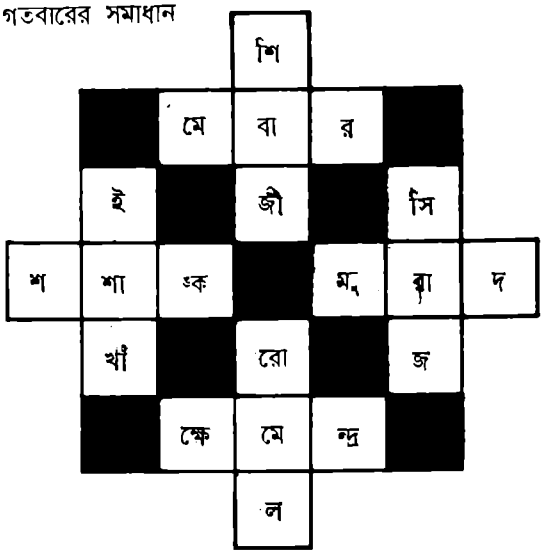

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

আন্ত-মণিমেলা সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্প্রতি মধ্য কলকাতার মিত্র ইনসটিটিউশন (মেন)-এ উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অসীমা গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, পলাশ মুখোপাধ্যায়, সনৎ মিত্র এবং দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। ফলাফল : ক বিভাগ—প্রথম, ঋষি অরবিন্দ; দ্বিতীয়, দক্ষিণপল্লী; তৃতীয়, যাদবপুর কলোনি; বিশেষ পুরস্কার, কবিগুরু। খ বিভাগ—প্রথম, পূর্বাচল; দ্বিতীয়, সবুজ বীথি। গ বিভাগ—প্রথম, অনির্বাণ; দ্বিতীয়, ঋষি অরবিন্দ।

মণি সন্দেশ

বিভিন্ন মণিমেলাগুলি গত পনেরোই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। জাতীয় পতাকা ও মণিমেলার পতাকা উত্তোলন, বেদগান, প্রভাতফেরি, ক্রীড়া প্রদর্শনী, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবন ও কর্মের আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জীবনী ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সংঘভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানসূচীর অঙ্গ ছিল। এছাড়া, হাওড়া-চক্‌শ্রীকৃষ্ণপুরের পল্লীমঙ্গল মণিমেলা এইদিন দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের মধ্যে পোশাক, পাঠ্যপুস্তক ও শ্লেট বিতরণ করে। যে-সব মণিমেলার স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপনের সংবাদ কেন্দ্রে এসেছে তাদের নাম : বিশ্বজিৎ (জামসেদপুর), শরৎস্মৃতি (গোবরডাঙ্গা), ঘাটাল (মেদিনীপুর), রবীন্দ্রনগর (দমদম ক্যান্টনমেন্ট), সীমান্তিকা (বনগাঁ), আতপুর বৈশাখী (শ্যামনগর), সিদ্ধার্থ (বর্ধমান), নবমিতালী (জগদ্দল), অনির্বাণ (যাদবপুর), পল্লীমঙ্গল (হাওড়া), সুপ্তোত্থিতা (কৃষ্ণনগর), মিত্র (জয়নগর) এবং রাজাপুর মিলনী (যাদবপুর) মণিমেলা।

গার্ডেনরীচের আদর্শ মণিমেলার ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব ৭ আগস্ট বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়।

মেদিনীপুরের শ্যামচক বিদ্যাসাগর মণিমেলার চতুর্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ৭ আগস্ট এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

গাইগাটার সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলার ব্যবস্থাপনায় ৬ থেকে ২৪ জুলাই ব্রতচারীর এক প্রাথমিক শিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

বিভিন্ন মণিমেলার ভাইবোনেরা ৯ আগস্ট রাখীবন্ধন উৎসব সাড়ম্বরে পালন করেছে। এইদিন মণিবোনেরা মণিভায়েদের হাতে রাখী পরিয়ে দেয়। ঘরোয়া পরিবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়। এই উৎসবে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল। যে-সব মণিমেলা থেকে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের খবর কেন্দ্রে এসেছে, তাদের মধ্যে আছে : ইন্টালি (কলকাতা), সূর্যসেন স্মৃতি (গাইঘাটা), ভাটপাড়া (২৪ পরগনা), রানী রাসমণি (হালিশহর) সুপ্তোত্থিতা, আতপুর বৈশাখী, নব মিতালী এবং অনির্বাণ মণিমেলা।

সুধাংশু ঘোষ

মৌমাছি মৌমাছি

এক মাস পরে জটা ফিরে এল। টিপুকে দেখে হাসল দাঁত বের করে। জটার পুরো নাম জটাধারী।

টিপু বলল, "আর মধু খাবি?"

জটা হাসতে হাসতে বলল, "খাবই তো। চাক ভাঙবার আসল কায়দাটা শিখে নিয়েছি।"

টিপু হাত নেড়ে বলল, "থাক, ঢের হয়েছে। তোর আসল কায়দাটা বনে-জঙ্গলে গিয়ে দেখাস। বাড়ির বাগানে আর নয়।"

জটা কাজ করে টিপুদের বাড়িতে। টিপুদের তিনটে গরুকে জাবনা দেয়, মানে বিচালি কেটে খইল মিশিয়ে খেতে দেয়। তাদের স্নান করায়, মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘাসও খাওয়ায়। বাজারে যায় কেরোসিন তেল, নুন ইত্যাদি আনতে। এই সব জটার কাজ। হাতে কাজ না থাকলে নানা রকম কীর্তি করে। মাইনে পায় দশ টাকা। খায় দায়, রাত্তিরে ঘুমোয় কাছারি-ঘরে।

অসুখ করায় এক মাসের ছুটি নিয়ে জটা বাড়ি চলে গিয়েছিল। অসুখটা অবশ্য বাধিয়েছিল নিজেই। সেই এক মাস টিপুদের খুব অসুবিধে গেছে। টিপুদের বাড়িটা তো ফাঁকা। সবাই থাকেন কলকাতায়। গ্রামের বাড়িতে শুধু মা। তিনি গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। সব থেকে ছোট ছেলে টিপু তাঁর সঙ্গে থাকে। টিপুর দশ চলছে, জটা তার থেকে পাঁচ বছরের বড়। জটার কোঁকড়ানো চুল, সে টিপুর থেকে অনেক বেশী ফরসা।

জটা না থাকলে ভারী অসুবিধে। টিপু তো আর গরুকে খেতে দিতে পারে না। তাদের চিতি গাইয়ের একটা কমলা রঙের বাছুর হয়েছে। সেটাকে আদর করতে অবশ্য টিপুর ভালো লাগে। বাছুরটা খুব মজা করে। মেজাজ এসে গেলে লেজটা আকাশের দিকে তুলে লাফায়।

কাজ না-থাকলে জটা খেলা দেখায়। একটার নাম সন্দেশের খেলা। একটি ছানার সন্দেশ পেলে খেলাটা দেখায়। বাগান থেকে একটা কলাপাতা কেটে এনে উঠোনে পাতে। তার ওপর মালার মতন করে সাজায় গোবর-দিয়ে-বানানো আট-দশটি সন্দেশ। ছানার সন্দেশটি রাখে মালার ঠিক মাঝখানে। তারপর জটা তার দু পা ওপরে তুলে দেয় কমলা রঙের বাছুরটার লেজের মতন। হাত দুটোর ওপর শরীরের ভার, মাথা নীচের

দিকে। ফরসা মুখ লালচে হয়ে যায়। এইভাবে জটা ময়ূর সাজে। তখন হাত দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে কমলা রঙের বাছুরটার মতন জিভ বের করে কলাপাতা থেকে ছানার সন্দেশটা তুলে নিয়ে যায়।

একবার এই খেলাটা দেখাবার সময় জেট-প্লেনের মতন উড়ে এসে একটা মশা জটার গালে বসেছিল। মশাটাকে তাড়াবার উপায় ছিল না, কারণ পা আকাশের দিকে, হাতের ওপর শরীরের ভার। পরে সন্দেশ খেতে-খেতে জটা নিজের গালে ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল।

সেবার জটা জামগাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। হাড় ভাঙেনি, মাথা ফাটেনি। তবে ডান হাতটা মচকে যায়। তারপর থেকে আজকাল আর সন্দেশের খেলাটা দেখাতে চায় না। একটার বদলে দুটো সন্দেশ দিলেও না।

এক মাস আগের এক বিকেলে টিপু সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। বইটই রেখে, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়েছে। এখন বাড়ির পাশের মাঠে খেলতে যাবে অন্য ছেলেদের সঙ্গে। উঠোনে জটার মুখোমুখি।

জটা বলল, "মধু খাওয়ার খেলা দেখবি, টিপু?"

টিপু বলল, "নতুন শিখেছিস বুঝি?"

"নতুন শিখব কেন? আগে থেকেই জানি।"

"দেখি কেমন খেলা।"

"তুই এখানে দাঁড়া। দেখবি কেমন মজা করে মধু খাই।"

জটার দু হাতে দুটো বড় পাথর। তাই নিয়ে বাগানের দিকে চলে গেল। জটার খালি গা, কাপড়টা হাঁটুর অনেক ওপরে এঁটে পরেছে। উঠোনের পশ্চিমে বাগান। বিকেলবেলায় গাছের ছায়া পুব দিকে লম্বা হয়ে পড়েছে উঠোনে। বাগানের এক আমগাছের ডালে মস্ত একটা মৌচাক হয়েছে। সবাই জানে। টিপুও দেখেছে দূর থেকে।

এখন জটা সেই আমগাছের তলায় গিয়ে মৌচাকে পর পর দুটো পাথর ছুঁড়ে মারল দারুণ জোরে। ভয়ে টিপু উঠোন থেকে বড় টিনের ঘরের বারান্দায় উঠে গেল।

পাথর ছুঁড়ে জটা আমগাছের গোড়ায় গিয়ে বসল। মুখ ওপরে তুলে হাঁ করে রইল। চাক থেকে টপটপ করে মধু পড়বে আর চেটে-চেটে খাবে। খেলাটা বুঝতে পারল টিপু, কিন্তু ভয় পেল।

মৌচাকের একটা পাশ ভেঙে গিয়েছিল। মধু পড়ল টপ-টপ করে। এক ফোঁটা জটার কোঁকড়ানো চুলে, এক ফোঁটা বুকে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার-হাজার মৌমাছি রেগে গিয়ে উড়ে

এসে জটাকে ছেয়ে ফেলল। দূরের বারান্দা থেকে এসব স্পষ্ট দেখতে পেল না টিপু, কিন্তু তখনই জটার চিৎকার শুনতে পেল। আমগাছতলায় ছটফট করতে করতে জটা চেঁচাচ্ছিল—'ওরে ঠামা রে, আমায় খেয়ে ফেললে রে!'

চিৎকার শুনে টিপুর মা ঘর থেকে বারান্দায় এলেন। আমগাছের গোড়ায় জটাকে ওই অবস্থায় দেখে হয়ত সবই আন্দাজ করলেন, তবু কী করা উচিত চট করে বুঝতে পারলেন না।

জটা বাগান থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল দিঘির দিকে। টিপু দেখল, জটা যেন টুক-টুকে ফরসা গায়ে একটা কুচকুচে কালো জামা পরেছে। শেষ বিকেলের অল্প আলোতেও চকচক করছে সেই কালো জামা। আসলে হাজার হাজার কালো মৌমাছি তার গায়ে সেঁটে আছে, হুল ফোটাচ্ছে। আরো এক ঝাঁক উড়ছে ছুটন্ত জটার সঙ্গে সঙ্গে। একটুক্ষণ টিপুর চোখে পলক পড়ল না।

মা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একখানা চাদর এনে জোর - পায়ে এগোলেন দিঘির দিকে, সঙ্গে টিপু। চিৎকার শুনে পাশের বাড়ির নন্তুকাকু এবং আরও কয়েকজনও ছুটে এল।

দিঘির পাড়ে এসে টিপু দেখল, জটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ডুব দিয়ে থাকছে জলের তলায়, দম ফুরিয়ে গেলে ভেসে উঠছে, আবার ডুব দিচ্ছে। ডুব দিয়ে থাকলে সেই জায়গাটায় জলের ওপর এক ঝাঁক মৌমাছি উড়ছে। নিশ্বাস নিতে জটা ভেসে উঠলেই মৌমাছিরা তার মুখে-মাথায় হুল ফোটাচ্ছে। মৌমাছিদের এমন রাগ।

ডুব-সাঁতার কেটে জটা অন্য দিকে সরে গেল। রাগী মৌমাছিরাও উড়ে গেল সেই দিকে। এইভাবে চলল বেশ কিছুক্ষণ।

নন্তুকাকু চিৎকার করে জটাকে ডাকতে লাগলেন—ঘাটের কাছে চলে আয়। শেষে ডুবে মরবি!

ডাক শুনে জটা ডুব-সাঁতার কেটে ঘাটের কাছে এলে নন্তুকাকু প্রায় কোমর জলে নেমে তাকে টেনে তুললেন। কয়েকটা মৌমাছি নন্তুকাকুর গায়ে হুল ফোটাল। টিপুর মা ঘাটের সিঁড়ির দুটো ধাপ নেমে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন জটাকে। মৌমাছিরা জটার আর কিছু করতে পারল না, কিন্তু দু-তিনটে উড়ে এসে হুল ফুটিয়ে দিল টিপুর মার হাতে।

সন্ধের পর জটার ভীষণ জ্বর হল। ভুল বকতে শুরু করল। কাঁপুনি থামছিল না। ডাক্তার ডাকা হল, খবর দেওয়া হল জটার ঠাকুমাকে। এই গ্রামেই অল্প দূরে জটাদের বাড়ি। তার ঠাকুমা তখনই চলে এলেন। জটার মা-বাবাকে কখনো দেখেনি টিপু, তার ঠাকুমাকেই দেখে আসছে। ঠাকুমার বয়েস বেশী হয়ে গেলেও শরীর খুব শক্ত। ধাই মা'র কাজ করেন।

ডাক্তারবাবু জটার হাতে আরও একটা হুল ফোটালেন, একটা ইনজেকশন দিলেন। খাবার ওষুধও দিলেন। সারা রাত ঠাকুমা জটাকে নিয়ে রইলেন কাছারি ঘরে।

পরদিন সকালে অত বড় ছেলে জটা তার ঠাকুমার কোলে উঠে বাড়ি চলে গেল। তখন জ্বর কমেছে। ঠাকুমার কোলে ওঠার আগে জটার গায়ে ভালো করে চাদর জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। টিপু এক ঝলক দেখতে পেল তার খালি গা। দেখেই কদম ফুলের কথা মনে পড়ল। কদম ফুলের রোঁয়ার মতন জটার সারা গায়ে মৌমাছির সাদাটে হুল ফুটে আছে।

সেই জটাধারী এক মাস পরে ফিরে এসে টিপুর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। জানিয়ে দিল নতুন কায়দায় মৌচাক ভেঙে আবার মধু খাবে।

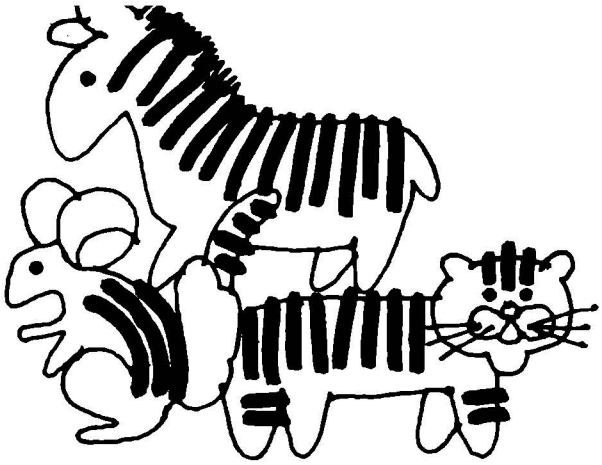

ছোটনের যুক্তি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কাকা বললেন "সেতু কি আর
বানরসেনাই খালি
বেঁধেছিল? সঙ্গে ছিল
ছোট্ট কাঠবেড়ালী।
ছোট্ট এবং শান্ত, আবার
দায়িত্বশীল অতি,
তার গায়ে হাত বুলিয়েছিলেন
তাইতো রঘুপতি।
তাইতো গায়ে কাঠবেড়ালীর
ফুটল সাদা ডোরা,
রামায়ণের গল্পটা তো
সবাই জানিস তোরা।"

"জানি, কিন্তু এও জানি যে,
কাঠবেড়ালীটার
সঙ্গে ছিল জেবরা এবং
বেঙ্গলী টাইগার।"
ছোটনবাবুর জবাব শুনে
ঢোঁক গিলে কন কাকা,
"জেবরা কেন থাকবে, কিংবা
সোঁদরবনের বাঘা?"

ছোটন বলে, "ছিলই, নইলে
জেবরা এবং বাঘের
শরীর কিসে ভর্তি হল
লম্বা-লম্বা দাগে?
গায়ের উপর হাত বুলিয়ে
রাম তাদেরও আদর
করেছিলেন বলেই তারাও
নকশা-কাটা চাদর
গায়ে দিয়ে ঘুরছে, তুমি
বুঝলে ছোটকাকু,
কাঠবেড়ালীর সঙ্গে ছিল
জেবরা এবং বাঘু।"

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
যুদ্ধ থামাও, বোকার দল!
রানীকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়াই ভাল।
যাক থেমেছ!
এবারে বর্ম পরে তারপর যুদ্ধ করো!
কী বিশাল
শুধু যে দেখতে বিশাল, তা নয়, দারুণ শক্তি ওদের! ওদেরই একজন তোমাকে বিয়ে করবে।
নাও, এবারে রাজা হবার লড়াই শুরু হোক!
দেখতে-দেখতে ধুন্দুমার লড়াই লেগে গেল!
দ্যাখো না! কমলা-রঙা হেলমেট-পরা ওই লোকটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান যোদ্ধা। কায়দা করে কেমন মার বাঁচাচ্ছে।
ওই জিতল।
এসো, তুমিই রাজা হবে!

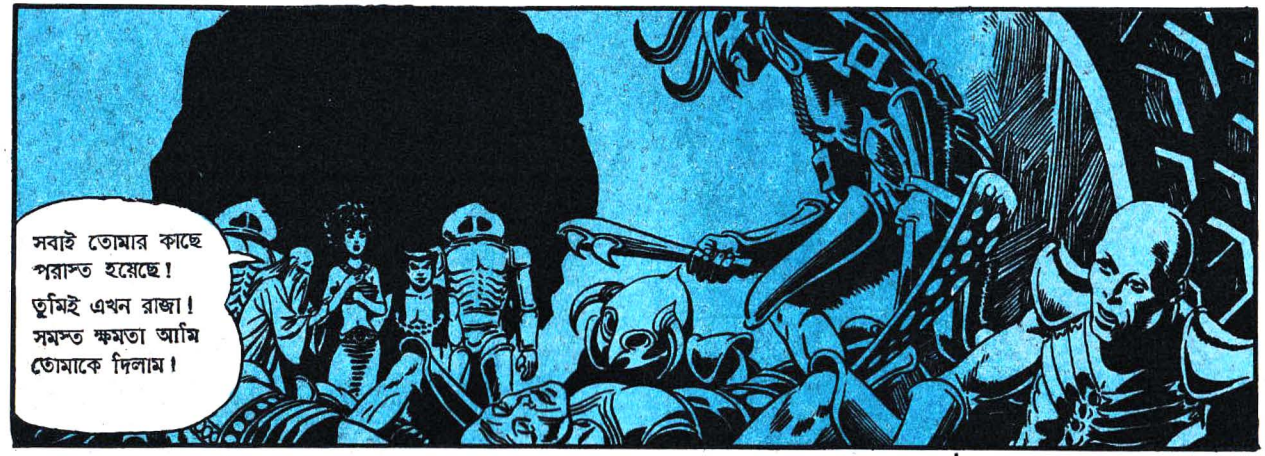

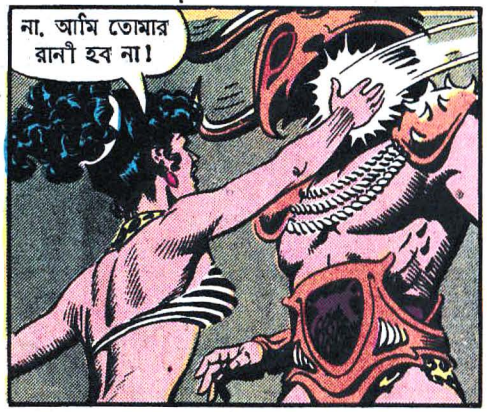

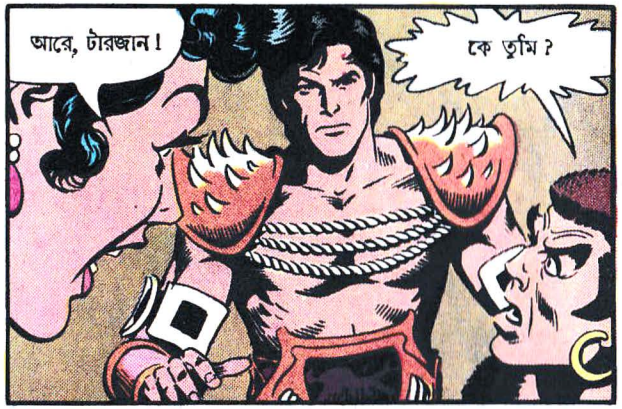

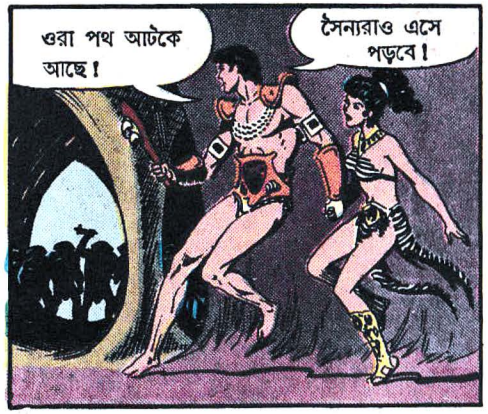

(এর পর আঠারোর পাতায়

বানাও

ঘুরতে মজা ঘুরিয়ে মজা

জানি, পুজোর ছুটিতে খুব ঘুরে বেড়ালে সবাই। কেউ পুরী। কেউ নৈনিতাল। কেউ দার্জিলিং। কেউ হাজারীবাগ। কেউ দেখতে পাহাড়। কেউ সমুদ্র। সমুদ্রে রোজ রোজ স্নান করে কালো হয়েছে কেউ কেউ। রোজ রোজ পাহাড়ে উঠে হাতে-পায়ে ব্যথাও হয়েছে কারো কারো। তা হোক। ঘোরার মজাটা তো পাওয়া গেল। আমাদের ছেলেবেলায় অত মজা ছিল না। ছেলেবেলাটা কেটেছে অজ পাড়াগাঁয়ে। ছুটিছাটায় যেতে হলে হয় মামার বাড়ি নয় মাসীর বাড়ি। আমরা ঘুরে বেড়াতাম আম-কাঁঠালের বনে, ভোরবেলায় ফুল-বিছোনো শিউলীতলায়, কাগজি লেবুর ভুরভুরে গন্ধ-মাখানো ঝোপে-ঝাড়ে। শুধু আমরাই ঘুরতাম না। আমাদের হাতে-হাতে ঘুরত পাঁতপেগে। তালগাছের পাতাকে মুড়ে ভাঁজ করে তৈরী হত। মাঝখানের ফুটোয় গলিয়ে দিলাম কাঁটার কাঠি। যত হাঁটি, যেদিকে হাঁটি, হাতের পাঁতপেগে বাতাসের ঠেলায় ঘুরছে বাঁই-বাঁই। বোধহয় পাতা থেকে তৈরী বলেই ঐ নাম গ্রাম-দেশে। ইংরেজীতে উইণ্ডমিল। হাতের কাছে তালপাতা আজ কোথায় পাবে। তাই কাগজ ভাঁজ করে কী ভাবে বানাতে হয়, সেটাই শিখে নাও। এরপর যখন কোথাও বেড়াতে যাবে, হাতে নিয়ে হেঁটো। ঘোরার সঙ্গে ঘুরিয়েও মজা পাবে।

পূর্ণেন্দু পত্রী

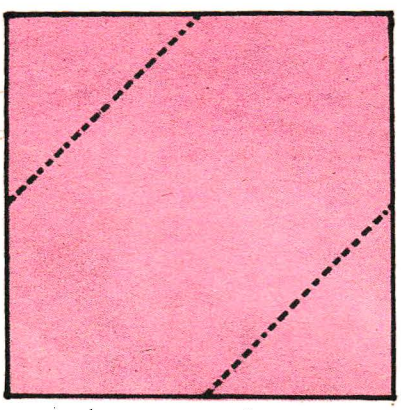

চারচৌকো কাগজ। ভাঁজের দাগ দেখে উপর দিকে ভাঁজ করো।

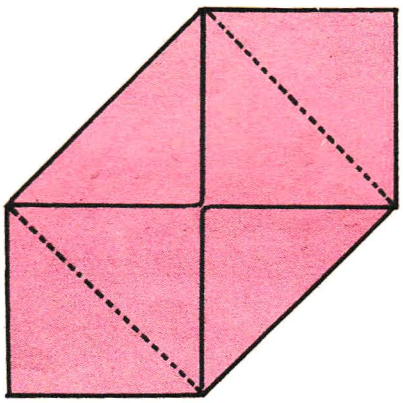

এবার ভাঁজ করো নীচের দিকে ভাঁজের দাগ দেখে।

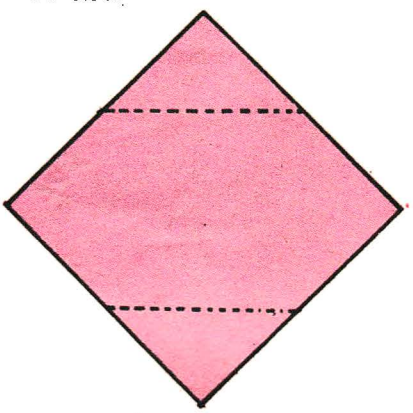

আবার ভাঁজের দাগ দেখে ভাঁজ করো সামনের দিকে।

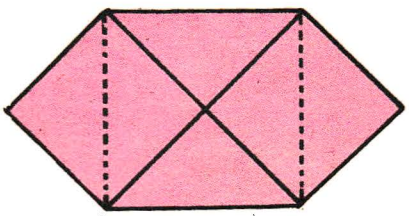

ভাঁজের দাগ দেখে পিছনে।

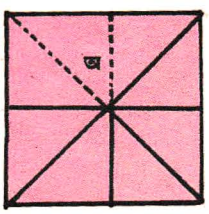

এবার 'অ' কোণটাকে টেনে তুলে নাও ওপর দিকে।

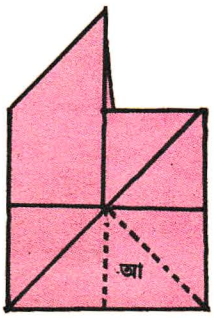

ঠিক তেমনি আ কোণটাকে টেনে নাও নীচের দিকে।

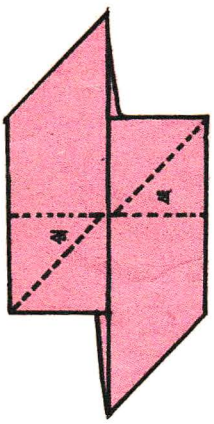

উল্টে নাও কাগজ। আগের মত ক আর খ কোণটাকে টেনে নাও উপরে এবং নীচে।

এবার ওর মাঝখানে কাগজ-কাটা ছোট গোল একটা চাকতি এঁটে দাও আঠা দিয়ে। এবং গোল চাকতির মাঝখানে একটা আলপিন ফুটিয়ে বাতাসের সামনে ধরো। বাঁই বাঁই করে ঘুরবে।

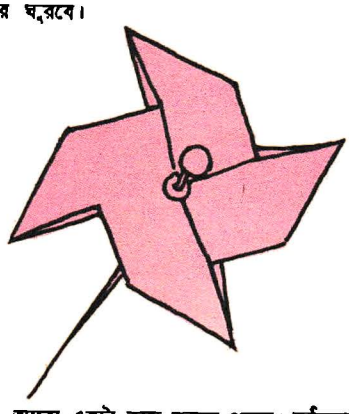

আরো একটা কাজ করতে পারো। বাড়িতে রং-তুলি আছে নিশ্চয়ই। ইচ্ছে করলেই গায়ে এঁকে নিতে পারো যার যেমন খুশি নক্‌শা। ঘোরার সময় দেখতে লাগবে চমৎকার।

পুরাণের কথা/ অমিতা চক্রবর্তী

মহাপ্রলয়ের গল্প

ঘটনাটি শুধু দারুণই নয়, অবাক হওয়ার মতোও বটে। আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাতা ওল্টালে এমন একটি কাহিনীর সন্ধান মিলবে যেটি ঠাঁই পেয়েছে অন্য বহু দেশের পুরাণকথায়। আমি মহাপ্লাবনের কথাই বলছি। পুরাণকারদের ধারণা বর্তমান প্রাণীজগৎ সৃষ্টির আদিতে মহাপ্রলয় হয়েছিল, আবার তা ঘটতে পারে বিলয়ের দিনে। তাঁদের মতে, অন্যায় ও অসত্যে পৃথিবী ভরে গেলে নেমে আসে প্লাবনের অভিশাপ। ধ্বংসের পরে আবার দেখা দেয় নতুন প্রাণের অঙ্কুর।

একাধিক ভারতীয় পুরাণের মতে বৈবস্বত মনুই বর্তমান সৃষ্টির আদি পুরুষ। একদিন তিনি যখন নদী-তীরে তপস্যা করছিলেন তখন একটি ছোট মাছ তাঁকে বলল, "বলবান মাছেরা দুর্বল মাছদের গ্রাস করছে। এই 'মাৎস্যন্যায়' থেকে (অর্থাৎ বড়মাছের পেটে যাওয়ার হাত থেকে) আমাকে রক্ষা করুন।" ঋষি তাকে পরম যত্নে আশ্রয় দিলেন একটি জলপূর্ণ মাটির পাত্রে। দিন যায়। মাছটিও বড় হতে থাকে। আর তো তাকে ধরে না সেই ছোট পাত্রে। অগত্যা সে আবার ঋষির শরণাপন্ন হয়। ঋষিও তাকে রেখে আসেন এক দিঘিতে। কিন্তু ক্রমশ মাছটি আয়তনে এতই বেড়ে ওঠে যে দিঘিতেও তার কুলোয় না। ঋষি তখন তাকে রেখে এলেন গঙ্গার জলে। আরও কিছুদিন যায়। মাছটি বাড়তেই থাকে। বিরাট সেই মাছের কাছে গঙ্গার পরিধিও যেন সংকুচিত হয়ে উঠল। এবার কী করা যায় এই মীননন্দনকে নিয়ে। বিশাল সমুদ্রই হয়ত এর যথাস্থান। মনু মাছটিকে রেখে এলেন সমুদ্রে। ঋষির কষ্ট দেখে মাছ তাঁকে বলে, "আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। আমিও নিশ্চয়ই প্রত্যুপকার করব। সৃষ্টির বিনাশের দিন আসন্ন। আপনি শক্ত দেখে একটি নৌকো তৈরী করুন। সমস্ত ধরনের বীজসহ সেই নৌকোয় উঠে পড়বেন মহাপ্লাবনের কালে। নৌকোর দড়ি বাঁধা থাকবে আমার মাথায়।" ঋষিও তৈরি হতে থাকেন মাছের কথামতো। অবশেষে এসে গেল সেই দারুণ সময়। বৃষ্টি! বৃষ্টি!! বৃষ্টি!!! দিনের পর দিন যায়, বর্ষণের আর বিরাম নেই। খালবিল নদী নালা সব একাকার। জীবজন্তু গাছপালা সব চাপা পড়ে গেল জলের তলায়। ক্রমশ ফুলে ফুঁসে ওঠে সেই বিশাল জলরাশি, যেন এক বিরাট সমুদ্র! ঋষি কিন্তু নৌকাটি সেই মাছের মাথায় বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত। মাছও ঠিক ভেসে চলেছে নৌকো নিয়ে। কোথাও আর নোঙর করার জায়গা পাওয়া যায় না। সে সাঁতার দিতেই থাকে। অবশেষে পাওয়া গেল এক পর্বতের চূড়া, নৌকো সেখানেই বাঁধা হল। অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে জলের বেগ কমে আসতে থাকে। আরও অনেক দিন পরে মাটি দেখা যায়। মনু নৌকোয় রাখা বীজগুলি ছড়িয়ে দেন মাটিতে। আবার ফিরে আসে সৃষ্টির যুগ।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্য বহু দেশের পুরাকাহিনীতেই এইরকম মহাপ্লাবনের গল্প পাওয়া যায়। গ্রীক পুরাণে দেখা যায়, মানুষের অন্যায়ে ক্রুদ্ধ দেবতা জিউস দেশ ধ্বংস করতে মনস্থ করলেন। প্রমিথিউসের পুত্র ডিউক্যালিয়নকে আদেশ দিলেন একটি নৌকো তৈরি করে সে যেন প্রস্তুত থাকে। মহাপ্লাবনের সময় এসে গেলে, স্ত্রী পাইরাকে নিয়ে নৌকোয় ভেসে রইলেন ডিউক্যালিয়ন। ভাসতে ভাসতে পার্নাসাস পর্বতের চূড়ায় এসে ঠেকল নৌকো। বর্ষণের কাল শেষ হলে দৈবাদেশ অনুসারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শক্ত হাড়ের মত পাথরের টুকরো ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন জলে, আর এইগুলি থেকেই সৃষ্টি হল নতুন জগতের। বাইবেলের নোয়ার জাহাজের গল্প তো তোমাদের সকলেরই জানা। পৃথিবী পাপে ভরে গেলে ঈশ্বরের আদেশে সাধু নোয়া তৈরি করলেন এক বিরাট জাহাজ। সেখানে আশ্রয় দিলেন নিজের পরিবার ও একজোড়া করে প্রায় সমস্ত প্রাণীদের। বহুদিন ধরে চলল অবিরাম বর্ষণ। আরারাট পর্বতে বাঁধা জাহাজের প্রাণীরা ছাড়া আর কেউই রক্ষা পেল না। মহাপ্লাবনের ধ্বংসলীলার পরে আবার পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির কাজ সম্ভব হল নোয়ার সহায়তাতেই। মেসোপটেমিয়ার গিলগামেশের মহাকাব্যে, ব্যাবিলোনিয়া, সুমেরীয় অ্যাসীরিয় ও অন্যান্য দেশের পৌরাণিক আখ্যানেও মহাপ্রলয়ের গল্প ছড়িয়ে পড়ে ছিল। এমন কি বিজ্ঞানীরা এইরকম ঘটনার পক্ষে বহু ভূতাত্ত্বিক প্রমাণও সংগ্রহ করেছেন।

(পনেরোর পাতার পর)

ব্যাপার কী? ওরা তোমাকে এখানে আনল কী করে?
গুবরে-পোকায় চড়িয়ে। পাহাড়ের মত উইঢিবি। তারই মধ্যে আমরা রয়েছি!

মানুষের তৈরী উইঢিবি!
বেরোবার আগেই ধরা না পড়ি!
নিশ্চয় বাইরে যাবার অনেক পথ আছে!

কারা যেন আসছে!
উঃ! কখন যে মুক্তি পাব! কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে!

তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে পড়ে যাই! ছোট্ট একটি মেয়ে আমাকে কুড়িয়ে পায়!

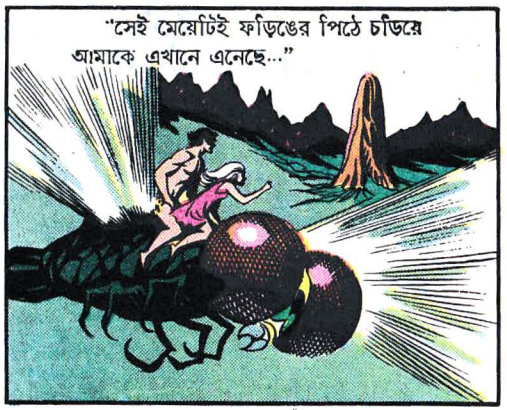
"সেই মেয়েটিই ফড়িঙের পিঠে চড়িয়ে আমাকে এখানে এনেছে..."

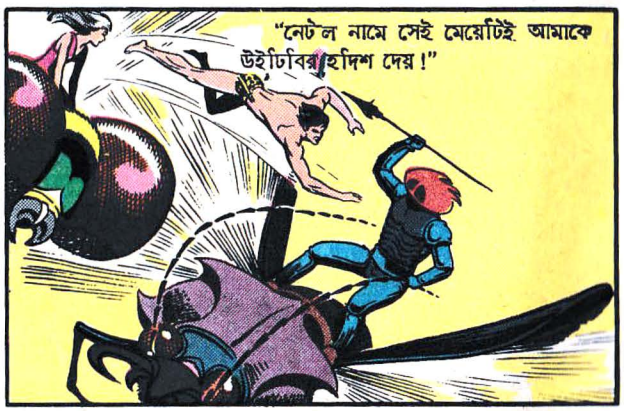
"নেট'ল নামে সেই মেয়েটিই আমাকে উইঢিবির হদিশ দেয়!"

"এদের সৈন্যের ছদ্মবেশে ঢিবিতে ঢুকে আমি তোমাকে দেখতে পাই!"

"যোদ্ধাদেরই একজনের বর্ম আর অস্ত্র আমি কেড়ে নিই!"

আশ্চর্য!
কে এই খাসমহলে ঢুকেছ?

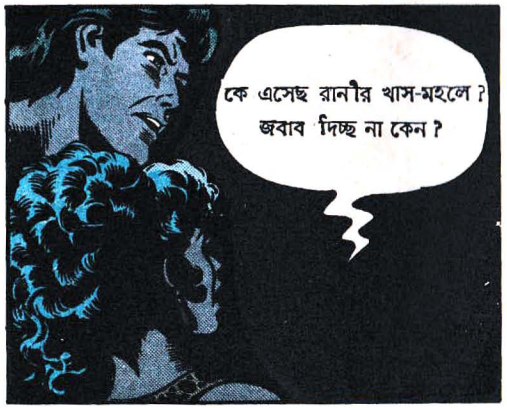
কে এসেছ রানীর খাস-মহলে? জবাব দিচ্ছ না কেন?

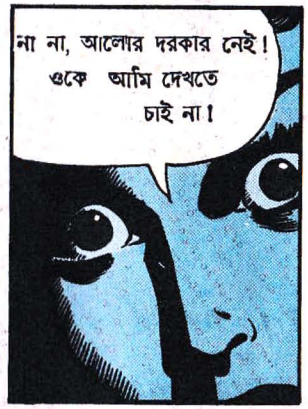

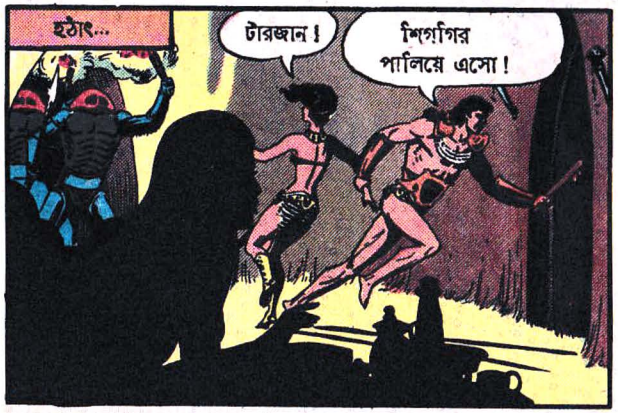

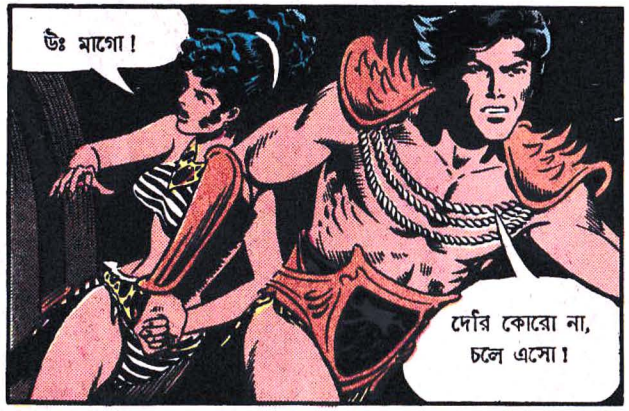

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ দ্বীপের রাজা

আগে যা ঘটেছে

'ভয়ংকর সুন্দর'-এর সেই সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছেন আন্দামানে। এর আগে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা আন্দামানে এসে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এবারেও ওরা দেখেছেন, কয়েকটি সাহেব মোটরবোটে চেপে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই রহস্যের সন্ধানে কাকাবাবু সন্তু আর দাশগুপ্ত নামে একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে মোটরবোট চেপে সমুদ্রের ওপর বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটা দ্বীপের জঙ্গলে জারোয়া নামে খুব হিংস্র আদিবাসীরা থাকে। সেখানে অন্যদের যাওয়া নিষেধ। কাকাবাবু জোর করে সেইখানে নেমে পড়লেন। সন্তু কিছুতেই কাকাবাবুকে ছেড়ে যাবে না। সেও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। তারপর—

৭

বোটের চালক শঙ্করনারায়ণ আর একটুও দেরি করল না। সে বোটটা চালিয়ে দিল গভীর সমুদ্রের দিকে।

দাশগুপ্ত পাগলের মতন লাফাতে লাগল। সে হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগল। "এ কি? এ কি? আমরা ওদের ফেলে চলে যাব নাকি? আমার তা হলে চাকরি যাবে! পাইলট, কোথায় চলে যাচ্ছ?"

শঙ্করনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, "বসে পড়ুন! বসে পড়ুন! গায়ে তীর লাগতে পারে!"

"অ্যাঁ?"

দাশগুপ্ত ধপাস করে বোটের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

শঙ্করনারায়ণ বলল, "সবাই মিলে একসঙ্গে মরে যাওয়ার কোনো মানে আছে? আমরা ওখানে আর একটুক্ষণ থাকলেই জারোয়ারা তীর মারত!"

"কিন্তু ওদের কী হবে?"

"মিঃ রায়চৌধুরীর কাছে রিভলবার আছে। তিনি গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে জারোয়াদের আটকাবার চেষ্টা করতে পারেন। পারবেন কিনা জানি না! আমাদের উচিত পুলিশের এস পি সাহেবকে সব কিছু জানানো। তারপর পুলিশ নিয়ে এসে যদি ওঁদের বাঁচানো যায়..."

মোটরবোটটা অনেক দূর চলে এসেছে। এখন দ্বীপের সেই জায়গাটা দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় জঙ্গল। ওর মধ্যে বিষাক্ত তীর নিয়ে লুকিয়ে আছে জারোয়ারা। ওখানে বাইরের লোক যে একবার গেছে সে আর ফেরেনি!

দাশগুপ্ত ফোঁস ফোঁস করে দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর তার এমনই দুঃখ হল যে, চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছোতে-পৌঁছোতে বিকেল হয়ে গেল। এস পি সাহেব অফিসে নেই। দাশগুপ্ত তক্ষুনি ছুটল তাঁর বাড়িতে। সেখানে গিয়েও এক দারুণ খারাপ খবর শুনল। এস পি সাহেব এইমাত্র লিট্‌ল আন্দামান রওনা হয়ে গেছেন।

দাশগুপ্ত হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ছিল, কিন্তু এস পি সাহেবের আর্দালি বলল, "সাহেব এই মাত্র বেরিয়েছেন, এখনো বোধহয় জেটিতে গেলে তাঁকে ধরতে পারবেন।"

দাশগুপ্ত আবার দৌড়ল জেটির দিকে। দূর থেকে দেখল, এস পির নিজস্ব মোটরবোট তখনো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে ছাড়বে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সে চ্যাঁচাতে লাগল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও! পাইলট, বোট ছেড়ো না!"

কোনো রকমে জেটিতে এসে সে লাফিয়ে মোটর বোটের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

এস পি সাহেবের মোটরবোটটা শুধু তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। ভেতরে তাঁর বসবার জায়গাটা সিংহাসনের মতন, লাল ভেলভেট দিয়ে মোড়া। এস পি সাহেবের চেহারাটাও দারুণ। টকটকে ফর্সা রং, বিশাল মোটা গোঁফ মিশে গেছে তাঁর লম্বা জুলফির সঙ্গে। অনেকটা হরতনের গোলামের মতন মুখ। কোমরে চওড়া বেল্টে গোঁজা রিভলবার, পায়ে কালো জুতো চকচক করছে। তিনি পা ছড়িয়ে বসে চোখ বুজে ছিলেন।

দাশগুপ্ত ধড়াম করে লাফিয়ে পড়তেই তিনি চোখ মেলে কটমট করে তাকালেন। হুংকার দিয়ে বললেন, "এখানে লাফালাফি করছ কেন? সার্কাস দেখাতে এসেছ?"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

"কিসের সর্বনাশ? তোমার তো রোজই একটা করে সর্বনাশ হয়!"

"না, স্যার! সেই যে মিঃ রায়চৌধুরী, যিনি ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি জারোয়াদের জঙ্গলে নেমে গেছেন!"

"কী?"

এস পি সাহেব এবার সোজা হয়ে বসলেন। এমনভাবে দাশগুপ্তর দিকে তাকালেন যেন ওকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন।

"তুমি সঙ্গে ছিলে, তাও উনি নেমে গেলেন কী করে?"

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে বলল, "স্যার, আমার দোষ নেই, আমি অনেক বারণ করেছিলুম, উনি কিছুতেই শুনলেন না। জোর করে নেমে গেলেন।"

"কতক্ষণ আগে?"

"প্রায় তিন ঘণ্টা আগে।"

"তা হলে দেখো গিয়ে, এতক্ষণে তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসছে। লোকটা কি পাগল না রাম-বোকা? লোকটা তো রোগা আর এক পা খোঁড়া, ওকে জোর করে আটকে রাখতে পারলে না?"

"স্যার, ওঁর কাছে রিভলবার আছে।"

এস পি সাহেব আবার আঁতকে উঠলেন। চিৎকার করে

বললেন, "রিভলবার? কে দিয়েছে? কার হুকুমে রিভলবার নিয়ে গেছে?"

"জানি না। আগেই ওঁর কাছে ছিল!"

"ছি ছি ছি ছি! এখন যদি একটাও জারোয়াকে গুলি করে মারে, তা হলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে! জারোয়াদের মারা বারণ, তা জানো না?"

"তা তো জানি। কিন্তু উনি যে কথা শুনলেন না!"

"বাঘ-সিংহই শিকার করা বন্ধ হয়ে গেছে। আর উনি কি মানুষ-শিকারে গেছেন? ইচ্ছেমতন জারোয়াদের গুলি করে মারবেন?"

"উনি গেছেন সেই রহস্যের সন্ধানে।"

"চুলোয় যাক রহস্য! জারোয়ারা আপনমনে নিজেদের দ্বীপে আছে, কে ওনাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে তাদের বিরক্ত করতে? রিভলবার থাকলেও উনি বেশীক্ষণ বাঁচতে পারবেন না। নিজে তো মরবেনই, আমাদেরও চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে!"

"এখন কী উপায় হবে, স্যার?"

"যাও, শিগগির প্রীতম সিংকে খবর দাও!"

মোটরবোটটা ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছিল। এস পি সাহেবের হুকুমে সেটা এসে আবার জেটিতে ভিড়ল। একজন গার্ড ছুটে গেল প্রীতম সিংকে ডেকে আনার জন্য।

প্রীতম সিং ছিলেন পুলিশের একজন ইনসপেকটর। এখন রিটায়ার করে পোর্ট ব্লেয়ারেই বাড়ি বানিয়ে আছেন। একমাত্র এই প্রীতম সিং-ই কয়েকবার জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন; তিনি জারোয়াদের ভাষাও জানেন। জারোয়ারা অন্য সবাইকে দেখলেই মারতে আসে, শুধু প্রীতম সিংকে কিছু বলে না।

আন্দামানে আদিবাসীদের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে বলে গভর্নমেন্ট নানাভাবে সাহায্য করে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। পুলিশের লোক গিয়ে মাঝে-মাঝে ওদের দ্বীপে নানারকম খাবার রেখে আসে। ভাত, চিনি, গুঁড়ো দুধ, নানারকমের ফল। পুলিশরা চলে যাবার খানিকক্ষণ পর জারোয়ারা এসে সেইসব নিয়ে যায়। তাদের জামা-কাপড় পরাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জামা-কাপড় রেখে এলে তারা নেয় না, শুধু তারা পছন্দ করে লাল কাপড়। লাল কাপড় নিয়ে তারা কী করে কে জানে! জারোয়াদের কিন্তু খুব আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে। তারা ঐ সব জিনিস এমনি-এমনি নেয় না। অবশ্য ঐ সব খাবার-দাবার আর লাল কাপড়ের বদলে টাকা-পয়সা তারা দিতে পারে না, কিন্তু অনেকখানি শুয়োর আর হরিণের মাংস ঐ জায়গায় রেখে যায় পুলিশদের জন্য।

প্রীতম সিং-এর দারুণ সাহস। একবার তিনি একা ঐ খাবারের বস্তার মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিলেন একদম ন্যাংটো হয়ে। জারোয়ারা কাছে আসতেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন। তার মানে তিনি আগেই দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে বন্দুক পিস্তল নেই, আর জারোয়াদের যেমন গায়ে পোশাক নেই, তেমনি তিনিও কোনো জামা-কাপড় পরেননি। জারোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। তাঁকে মারেনি।

তারপর থেকে আস্তে-আস্তে তাঁর সঙ্গে জারোয়াদের ভাব হয়ে যায়। তিনি নিজেই কয়েকবার খাবার নিয়ে গেছেন। এর পরে তিনি জামা-কাপড় পরে গেলেও জারোয়ারা তাঁকে অবিশ্বাস করেনি। এখন অবশ্য তিনি বুড়ো। এখন আর পুলিশের কেউ জারোয়াদের কাছে যেতে সাহস করে না।

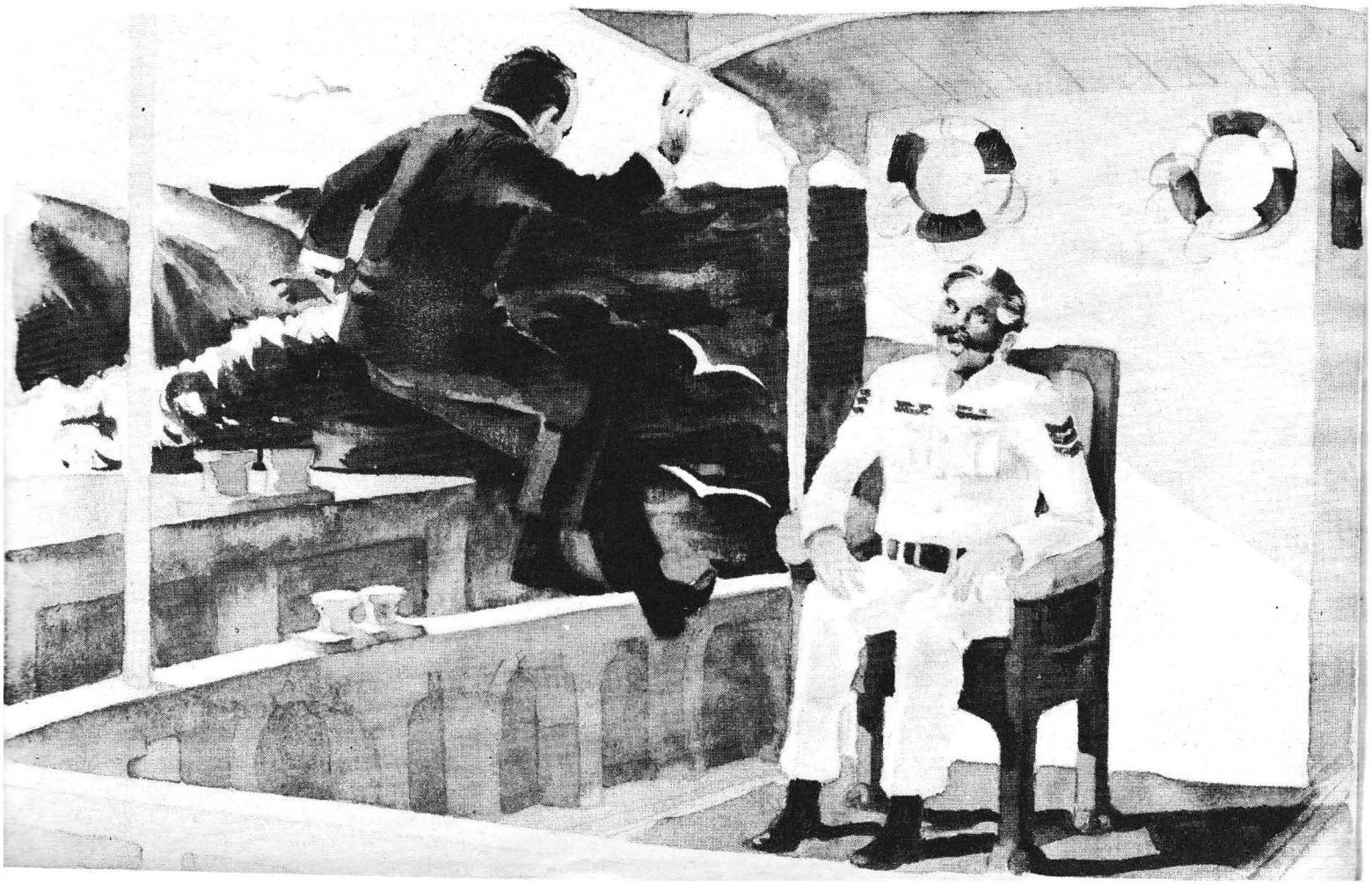

শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত বিমল কর যা-ই লিখুন, নতুন ধরনের লেখেন। ছোটদের জন্যে তিনি এক রহস্যকাহিনী লিখেছেন—তাতে গোয়েন্দাও আছে, অপরাধও আছে, আছে এক দুর্ধর্ষ অপরাধীও। কিন্তু তারা সবাই-ই একেবারে অন্যরকমের; আর দশটা বইয়ের গোয়েন্দা বা অপরাধীর মতো একেবারেই নয়। এই 'আনন্দমেলা'তেই বেরিয়েছিল সেই আশ্চর্য গল্প—'কাপালিকরা এখনও আছে'। যারা একটু একটু করে মাসে মাসে পড়েছ, তারা এখন একসঙ্গে দু মলাটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ পুরো গল্পটা। একবারে পড়লে দেখবে, ওই পড়া গল্পই আরও কত ভাল লাগছে। আর, যাদের কোনও কারণে পড়া হয়ে ওঠেনি, তারা যদি পড়—সে আর বলতে হবে না! একবার পড়েই দেখ না!

বিমল কর
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০
ওআওার মামা ৬.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

নকুল মুখোপাধ্যায়
দেবতার পাহাড় ৩.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
সত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘন্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশু সাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্‌পো ৮.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ২.০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার বুক ৪.০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়
দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে৪.০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ি ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রীতম সিং এই কিছুদিন আগেও জারোয়াদের কাছে একবার গিয়েছিলেন। রঘুবীর সিং নামে একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার যখন এখানে ছবি তুলতে আসেন, তখন প্রীতম সিং-ই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন জারোয়াদের দ্বীপে। প্রীতম সিং সঙ্গে ছিলেন বলেই জারোয়ারা সেই ফটোগ্রাফারকে মারেনি।

একটু বাদেই প্রীতম সিং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দাড়ি, গোঁফ, চুল সব সাদা। কিন্তু এখনো খাঁকি প্যাণ্ট সার্ট পরতে ভালোবাসেন। সব ঘটনা শুনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "খুবই চিন্তার কথা। ঐ সাহেবকে বাঁচানো খুবই শক্ত। যদি না এতক্ষণে মরে গিয়ে থাকেন!"

দাশগুপ্ত বলল, "ওঁর কাছে তো রিভলবার আছে। চট্ করে মারতে পারবে না।"

প্রীতম সিং বললেন, "আপনি জানেন না। জারোয়ারা একদম মরতে ভয় পায় না। একজনকে মারলে অমনি আর একজন এগিয়ে আসে। ওরা যদি চারদিক থেকে তীর-ধনুক নিয়ে এগিয়ে আসে, তা হলে উনি একা রিভলবার দিয়েই বা কী করবেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "তবু এক্ষুনি আমাদের যাওয়া দরকার। একবার চেষ্টা করা উচিত অন্তত।"

প্রীতম সিং বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হবেন না। বাঙালী ভদ্রলোক যদি এখনো সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে থাকতে পারেন, তা হলে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে আর উপায় নেই। জারোয়াদের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল বটে, কিন্তু খাতির হয়নি। ওরা খুব কম কথা বলে। ওদের ভাষাতেই মোট তিরিশ-চল্লিশটার বেশী শব্দ নেই। ওরা আমাকে মাটিতে দাগ কেটে দেখিয়ে বলেছিল, আমি যেন তার ওপাশে কক্ষনো না যাই! বনের ভেতরে আমাকে কোনোদিন যেতে দেয়নি। আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে একজন এমন-কেউ আছে, যার খুব বুদ্ধি, তার কথাই ওরা মেনে চলে। একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে ওরা সেদিন তার উত্তর না দিয়ে পরের বার দিত। আমি অনুরোধ করেছিলাম, একবার ওদের সারা দ্বীপটা ঘুরে দেখার জন্য। ঐ দ্বীপের ভেতরে তো সভ্য মানুষ কেউ যায়-নি, ওখানে কী আছে, কেউ জানে না। কিন্তু পরের দিন এসে বলেছিল, না, যাওয়া চলবে না। সেদিনই মাটিতে দাগ কেটে সীমা টেনে দেয়।"

দাশগুপ্ত বলল, "আমার সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যাব। আপনি শুধু ওদের বুঝিয়ে বলবেন যে, আমরা ওদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসিনি।"

"আমার সে-কথা ওরা শুনবে না! এ রকম চেষ্টা কি আগে হয়নি? অনেকবার হয়েছে। কোনো লাভ হয়নি। একবার কী হয়েছিল শুনবেন?"

প্রীতম সিং এস পি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি তখন এখানে আসেননি। সে-সময় এস পি ছিলেন মিঃ ভার্মা। তাঁর কথামতন পুলিশরা ফাঁদ পেতে তিন-জন জারোয়াকে ধরে ফেলে। জ্যান্ত অবস্থায়। তারপর তাদের হাত পা শিকলে বেঁধে নিয়ে আসা হল। পোর্ট ব্লেয়ারে এনে তাদের শিকল খুলে দিয়ে খুব আদর-যত্ন করা হল। খাওয়ানো হল ভাল-ভাল খাবার। হেলিকপ্টারে চাপিয়ে তাদের দ্বীপ আর অন্যসব দ্বীপ দেখিয়ে আনা হল। অর্থাৎ তাদের বোঝানো হল যে, আমরা তাদের শত্রু নই, আমরা তাদের মারতে চাই না—তাদের দ্বীপটাই শুধু পৃথিবী নয়—বাইরে আরও কত জায়গা আছে, কতরকম মানুষ আছে। তিনদিন বাদে তাদের ফিরিয়ে

দিয়ে আসা হল তাদের দ্বীপে—যাতে তারা গিয়ে অন্যদের বলতে পারে যে, সভ্য লোকরা তাদের মারেনি, বরং আদর করেছে। এরপর কী হল বলতে পারেন?"

এস পি সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি ঘটনাটা। পরদিন দেখা গেল সেই তিনজন জারোয়ার মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসছে।"

প্রীতম সিং বললেন, "অন্য জারোয়ারা তাদের মেরে ফেলেছে। তারা মনে করে, সভ্য লোকদের ছোঁয়া লেগে ঐ তিনজন অপবিত্র হয়ে গেছে। তাহলেই বুঝুন, ওরা কতটা ঘেন্না করে আমাদের।"

দাশগুপ্ত বলল, "তবে কি আমরা কিছুই করব না? এখানে চুপ করে বসে থাকব?"

এস পি বললেন, "উনি একটা বয়স্ক লোক। নিজে যদি ইচ্ছে করে সেখানে যেতে চান, তাহলে নিজেই তার ঠ্যালা বুঝবেন! আমাদের কী করার আছে?"

"তা বলে আমরা লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না? আমার কাছে দিল্লি থেকে অর্ডার এসেছে, ওঁকে সবরকমভাবে সাহায্য করার। স্যার, এক্ষুনি চলুন পুলিশ ফোর্স নিয়ে।"

এস পি সাহেব বললেন, "তারপর জারোয়ারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়বে, সেগুলো কি আমরা খেয়ে হজম করে ফেলব?"

প্রীতম সিং বললেন, "বনের মধ্যে ওরা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। তা হলে লড়াই লেগে যাবে।"

দাশগুপ্ত বলল, "দরকার হলে আমাদের গুলি চালাতে হবেই, উপায় কী?"

এস পি সাহেব বললেন, "আমরা শুধু-শুধু ওদের মারব? কেন, ঐ ভদ্রলোককে কে ওখানে যেতে বলেছিল?

সারা পৃথিবীতে রটে যাবে যে, আমরা আমাদের আদিবাসীদের গুলি করে মারি।"

প্রীতম সিং মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "বাঙালী ছাড়া এমন উদ্ভট শখ আর কারুর হয় না। জারোয়াদের গুলি করে মারা আমিও সমর্থন করি না।"

দাশগুপ্ত এস পি সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "স্যার, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে!"

এস পি সাহেব বললেন, "আমাকে তাহলে দিল্লিতে হোম সেক্রেটারির কাছে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। গভর্নমেণ্টের হুকুম ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না।"

"কিন্তু স্যার, দিল্লি থেকে হুকুম আসতে অন্তত একদিন লেগে যাবে।"

এস পি সাহেব বললেন, "একদিন অপেক্ষা করতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

দাশগুপ্ত প্রায় কান্না-কান্না গলায় বলল, "ওঁর সঙ্গে সেই ছোট ছেলেটিও আছে। হায়, হায়, এতক্ষণে ওদের কী হয়েছে, কি জানি!"

এদিকে সন্তু জলে লাফিয়ে পড়ার পরই ভাবল, তাকে কুমিরে ধরবে। সে ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু সাঁতার কাটতে হল না। সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ তাকে পাড়ে এনে পৌঁছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠেই ছুটে চলে এল একটা গাছের আড়ালে।

আর-একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর চাপা গলায় বললেন, "তুমি বোকার মতন জলে লাফিয়ে পড়লে কেন? তোমাকে পোর্ট ব্লেয়ারে চলে যেতে বললুম না?"

সন্তু বলল, "আপনি কেন এলেন?"

"আমি এসেছি, বেশ করেছি। আমি বুড়ো মানুষ, কোনো একটা বড় কাজের জন্য যদি আমি মরেও যাই, তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মাকে আমি বলে এসেছি তোমার কোনো বিপদ হবে না।"

"মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, সব সময় আপনার কাছাকাছি থাকতে!"

"আঃ! তুমি এমন গণ্ডগোল বাধালে! যাক গে, তুমি আমার পেছনে এসে দাঁড়াও! একটুও নড়বে না। কোন শব্দ করবে না!"

দু'জনে খানিকক্ষণ কান খাড়া করে রইল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। বোধহয় জারোয়ারা এখনো তাদের আসার ব্যাপারটা টের পায়নি। সামনে থেকেই শুরু হয়ে গেছে ঘন জঙ্গল। ফাঁক নেই একটুও। এত ঘন জঙ্গলের মধ্যে গায়ে তীর লাগবার খুব ভয় নেই। একটু দূর থেকে তীর-ছুঁড়লে কোনো না কোনো গাছে আটকে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা বুঝতে পারল কাছাকাছি কোনো জারোয়া নেই। তখন পা টিপে-টিপে ওরা জঙ্গলের মধ্যে এগোতে লাগল। পায়ের তলার মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। গাছ থেকে খসে পড়া অসংখ্য পাতা পচে নরম হয়ে আছে। এখানে যখন-তখন বৃষ্টি হয়।

কাকাবাবু ভাবছেন, সমুদ্রের ধার থেকে যত দূরে সরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। এতবড় জঙ্গলের মধ্যে জারোয়ারা তাঁদের চট করে খুঁজে পাবে না। জঙ্গলের মধ্যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

কাকাবাবুর ক্রাচটা হঠাৎ এক জায়গায় নরম মাটিতে গেঁথে গেল। তিনি সেটা টেনে তুলতে গিয়ে তাল সামলাতে পারলেন না, পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সন্তু তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরল। তারপর সে নিজেই ক্রাচটা উপড়ে তুলল কাদা থেকে।

সন্তু ভাবল, কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন না। এই রকম জঙ্গলের মধ্যে তো আরও অসুবিধে। তবু তিনি সন্তুর ওপর রাগারাগি করছিলেন। ভাগ্যিস সন্তু জোর করে চলে এসেছে!

কাকাবাবু একটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সন্তু একটুখানি এগিয়ে দেখতে গেল। সব সময় গা-টা শিরশির করছে। দাশগুপ্ত বলেছিল, এখানকার জঙ্গল এত গভীর হলেও বাঘ-সিংহের কোনো ভয় নেই। সবচেয়ে বেশী ভয় মানুষের! সন্তুর খালি মনে হচ্ছে, কাছেই কারা যেন লুকিয়ে থেকে তাকে দেখছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সন্তু ওপরের দিকে মুখ তুলে দেখতে লাগল, কোনো গাছের ওপর কেউ বসে আছে কিনা। অবশ্য এখানকার গাছে ওঠা সহজ নয়। প্রায় সব কটা গাছই বিরাট-বিরাট লম্বা। প্রথম দিকে অনেকখানি উঠে গেছে সোজা হয়ে, কোনো ডাল-পালা নেই, মাথার কাছটা প্রকাণ্ড ছাতার মতন। এক-একটা গাছের বয়েস বোধহয় দু'শো তিনশো বছর। গায়ে শ্যাওলা ধরে গেছে।

হঠাৎ দূরে একটা ছরছর শব্দ হল। ভয়ে কেঁপে উঠল সন্তু। কারা যেন ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে আসছে। এইবার তা হলে আসছে জারোয়ারা। আর উপায় নেই। সন্তুও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর পাশে। কাকাবাবুও আওয়াজটা শুনেছেন। তিনি সন্তুকে ধরে এনে দাঁড়ালেন দুটো বড় গাছের ফাঁকে। হাতে রিভলবার।

একটু বাদেই ওদের খানিকটা দূর দিয়ে ছুটে গেল দুটো হরিণ। তারপর আরও তিনটে। শেষ হরিণটি ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে আরও জোরে দৌড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "সাবধান একটুও নড়বি না। হরিণগুলোকে তাড়া করে পেছনে মানুষ আসতে পারে।"

কিন্তু কোনো মানুষ এল না। হরিণগুলো এমনিই দৌড়চ্ছে। সন্তু বোধ হয় ইচ্ছে করলে একটাকে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন সে-সময় নয়।

কাকাবাবু বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের চেষ্টা করতে হবে জারোয়াদের চোখ এড়িয়ে যাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসা যায়। তারপর কাল সকালেই দাশগুপ্ত পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে, তখন আমরা চলে যাব। চল এগোই!"

চারদিক দেখতে দেখতে খুব সাবধানে ওরা এগোতে লাগল। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। খানিকটা দূরে একটা খুব আস্তে শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় জলের শব্দ। নিশ্চয়ই ওখানে কোনো ঝর্না আছে। সন্তুর মনে পড়ে গেল তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তার গায়ের সমস্ত জামা-প্যাণ্ট ভিজে। জুতোটাও ভিজে থপ থপ করছে। কিন্তু তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

কাকাবাবু সেই জলের শব্দটা লক্ষ করেই এগুতে লাগলেন। হঠাৎ সন্তু কিসে একটা হোঁচট খেল।

নিচু হয়ে দেখল, একটা মানুষ। প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক, গায়ে কোনো জামা-কাপড় নেই। লোকটা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটো খোলা।

সন্তু ভয়ে আঁ করে শব্দ করতে গিয়ে নিজেই মুখে হাত চাপা দিল। (ক্রমশ)

উচ্চ-মাধ্যমিক হিউম্যানিটিজ-এ ফার্স্ট জয়ন্তীর কথা শোনো

বাংলায় ১৩১, ইংরেজীতে ১১৬, সংস্কৃতে ১৬০, সাইকোলজিতে ১৬০, ভূগোলে ১৪১ আর অ্যাডিশানাল সাবজেক্ট লজিকে পাশ মার্ক বাদ দিয়েও ১১৪—মোট ৮২২, রিভিউয়ের পর আরও ১৮ নম্বর যোগ করে ৮৪০—এই মার্কশীট এবারের হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় হিউম্যানিটিজ-এ প্রথম হওয়া মেয়ে জয়ন্তী রায়-চৌধুরীর। আট বছর বয়েসে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম, স্কুলে প্রতি বছর প্রথম, হায়ার সেকেণ্ডারিতেও প্রথম, বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস স্কুলের ছাত্রী জয়ন্তীর নেশা কিন্তু গল্পের বই পড়া। বাংলা সাহিত্যের মনোযোগী পাঠিকা জয়ন্তী নৃত্য ও ছবি আঁকাতেও পারদর্শিনী। বাড়িতে শিক্ষকের কাছে নিয়মিত ভারতনাট্যম শেখে, তুলি চালায় কাগজে, জল রং ছেড়ে তেল রং ধরেছে।

টালা পার্ক অ্যাভেনিউয়ে জয়ন্তী-দের ফ্ল্যাটে বসে ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি অবাক হয়ে যাই। রবীন্দ্র-নাথ, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, অজিত দত্ত ওর প্রিয় কবি। বলল "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মুজতবা আলী আমার খুব ভাল লাগে।"

আমি বললাম, "সাহিত্য, নাচ, ছবি আঁকা—এসব যে তোমার এত ভাল লাগে, তাতে লেখাপড়ায় কোনও অসুবিধে হয়নি কখনও?"

"তা কেন, স্কুলও তো আমার খুব ভাল লাগত।"

"বাড়িতে তোমাকে কে পড়াতেন?"

"ছোটবেলা থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পুরো সময়টাই বাড়িতে মায়ের কাছে পড়াশুনো করেছি। ক্লাসের পড়ার জন্যে যতটুকু দরকার, মা সব সময়ই তার চেয়ে বেশী জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। এখন বুঝতে পারি, তাতে আমার খুব উপকার হয়েছে।"

"হায়ার সেকেণ্ডারিতে তুমি যে হিউম্যানিটিজ-এ প্রথম হলে, এজন্যে তুমি কীভাবে কার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছ?"

"আমাদের স্কুলের দিদিদের কাছ থেকে সত্যিকারের সাহায্য পেয়েছি। বই দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে তাঁরা আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। লাইব্রেরিয়ানও অনেক দরকারী বই পেতে আমাকে সাহায্য করেছেন।"

"সারাদিনে কতক্ষণ পড়তে?"

"স্কুলের দিনে সকালে ছটা থেকে নটা, সন্ধেবেলায়ও ওই রকম। ছুটির দিনে সারা দুপুর। তবে আমার তো গল্পের বই পড়ার নেশা, তাই খুব বেশীক্ষণ স্কুলের পড়া নিয়ে থাকতে পারিনি।"

"তোমার হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট দেখে তুমি অবাক হওনি?"

"ভীষণ! আমি এতটা আশাই করিনি। ভেবেছিলাম, মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করব।"

"ভাল রেজাল্ট করবার জন্যে তুমি কীভাবে তৈরী হয়েছিলে?"

"ভাল ভাল বই পড়েছি, তার থেকে নোট নিয়েছি। লজিক, সাই-কোলজি, ভূগোল—এই সব বিষয়ে আমি বি এ ক্লাসের বই-ও পড়েছি। ছোটবেলা থেকেই তো মা আমাকে একটু হায়ার ক্লাসের বই পড়াতেন। ওই সব বাইরের বই থেকে নোট নিয়ে আমি নিজেই খুব লিখতাম। লেখাটাই আমার পড়বার মূল পদ্ধতি।"

"লেখাপড়ায় ভালো হতে গেলে সব কিছু কি মুখস্থ দরকার, না ভাল মতন বুঝে নিলেই চলে?"

"আমাদের স্কুলে মুখস্থ করার ওপর একেবারেই জোর দেওয়া হয় না, বুঝে নেওয়াটাই আসল কথা।"

ষোলো বছরের মেয়ে জয়ন্তী গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজে সাইকোলজি অনার্সে ভর্তি হয়েছে। ওর কথা মাসিক আনন্দমেলায় ছাপা হবে শুনে হাসিখুশি জয়ন্তী বলল, "মাসিক আনন্দমেলা আমি সবে পড়তে শুরু করেছি। এত দিন কেন পড়িনি ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এটা তো খুব সুন্দর পত্রিকা। একেবারে নতুন, একেবারে অন্যরকম, আমি ও আমার মা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। রঙিন ছবি-গুলোও ভারি সুন্দর।"

শুধু ভাল পাঠিকাই নয়, জয়ন্তী লেখেও। কী লেখে?

মনস্তত্ত্বের ছাত্রীটির মুখে এবার একটু লজ্জা ফুটল। বলল, "কবিতা লিখি, মাঝে-মধ্যে দু-একটা প্রবন্ধ। সন্দেশে হাত পাকাবার আসরে আর রামধনুতে অনেক কবিতা লিখেছি। কৃত্তিবাসেও একটা পাঠিয়েছিলাম, ছাপা হয়েছিল। আমার লেখার খুব ইচ্ছে, কোনদিন ছাড়তে পারব বলে মনে হয় না।"

—অমর বাউল

আঁকো রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারও কিন্তু একটি আকারেই নকশার খেলা। তবে একই আকারের গায়ে একটু ঢেউ দিলে কেমন আর-এক জিনিস হয়ে পড়ে, তা আমার করা নমুনা দেখেই বুঝতে পারছ। এমনভাবেই একই আকারের সামান্য রকমফেরে নানান নকশার আসা-যাওয়া। তোমরা তো এর আগে নানা রকমের আকারকে কাজে লাগিয়ে নানান রকমের নকশা করে ফেলেছ। এবারে এই আকারগুলোকেও কাজে লাগাও আর নকশা বানাও। আমি যেমন নকশা বানিয়েছি, তেমন বানাবার দরকার কী? তোমরা যে-যার নিজের মাথা থেকে নকশা বার করো; তবে হ্যাঁ, এই আকারকে সেখানে কাজে লাগানো চাই।

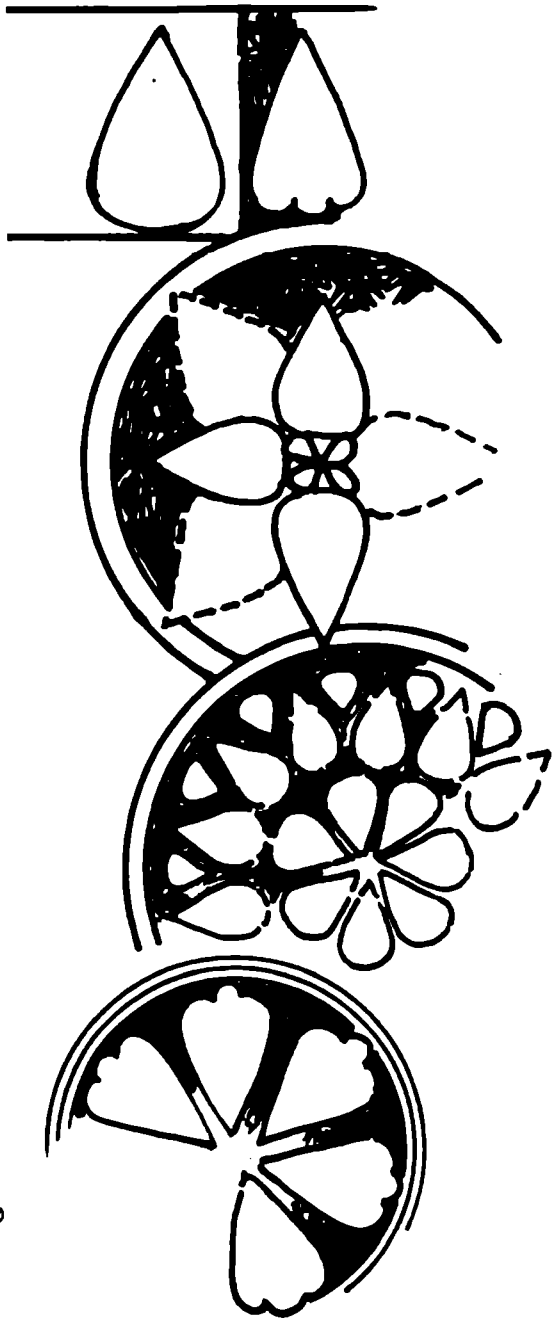

শেখো কারিগর

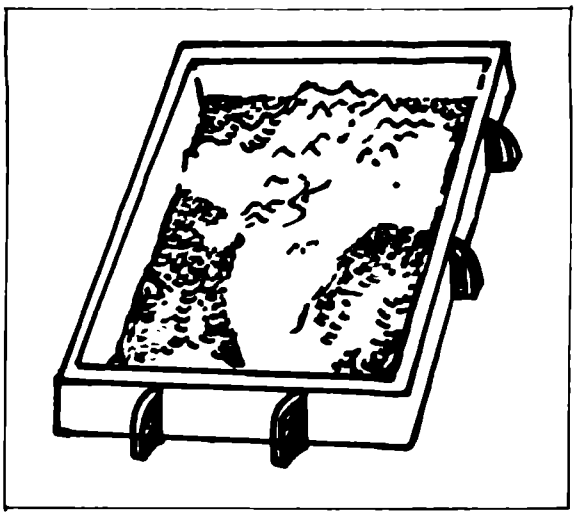

কাগজ-মণ্ডনের কাজ

অনেক সময় একই জিনিসের বেশ কয়েকটি নকল দরকার হয়, বিশেষ করে স্কুলের প্রজেক্টের কাজে। এই ছাঁচ করার পদ্ধতি রিলিফ করার মধ্য দিয়ে জানলেও যে কোন প্রজেক্টের প্রয়োজনে অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারো।

এবার জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো—প্যারিস প্লাস্টার, ভেসলিন, টিশু পেপার বা পাতলা কাগজ, কাঠের টুকরো আর মাটি।

শুরু করো। তোমার করা প্রথম রিলিফ-ম্যাপের গায়ে ভালোমত ভেসলিন মাখিয়ে, তার ওপর পাতলা কাগজ (টিশু) এমনভাবে বিছিয়ে দাও, যাতে ম্যাপের সব জায়গায় লাগে। কাজ শেষ হলে, এখানে-দেওয়া ছবির মত ম্যাপের উচ্চতা অনুসারে কাঠ বা মাটির দেওয়াল দাও।

এবার গামলায় জল দিয়ে আস্তে আস্তে প্লাস্টার ঢালতে থাকো। তোমার প্রয়োজন অনুসারে গাঢ় রেখে তা ম্যাপের ওপর ঢেলে যাও আস্তে আস্তে ম্যাপটা সম্পূর্ণ না ঢাকা পর্যন্ত। এবার প্লাস্টার শুকবার সময় দিয়ে চারপাশের দেওয়াল খুলে নিয়ে নীচে বোর্ড সমেত আস্তে করে উল্টে ধরলেই ছাঁচ বের হয়ে আসবে।

ছাঁচ ভালোমত শুকিয়ে গেলে তার গায়ে ভেসলিন মাখিয়ে পাতলা কাগজের আস্তর বিছিয়ে, তৈরী মণ্ডনের আস্তর দাও প্রয়োজন-মাফিক।

মণ্ডন শুকিয়ে গেলে, একটু টান দিলেই, ছাঁচ থেকে আলাদা হয়ে আর-একটা রিলিফের নমুনা তোমার হাতে আসবে। এমন-ভাবে পর পর ছাঁচ নাও যত খুশি।

জেনে রাখো—(১) প্লাস্টার জলে মেশাবার সামান্যক্ষণ বাদে জমাট বাঁধতে শুরু না-করলে জানবে প্লাস্টার খুব তাজা নয়। (২) কাঠ বা মাটির প্রলেপ না দিলে গোলা প্লাস্টার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আসতে পারে। (৩) প্রত্যেকবার ছাঁচ নেবার আগে ভেসলিন মাখিয়ে নেবে। (৪) দেওয়ালের উচ্চতা ম্যাপের উচ্চতার চেয়ে কিছু বড় হবে।

ধাঁধা আর ধাঁধা

টেবিলের ওপর পাঁচটি ঢাউস উপন্যাস। একেবারে আনকোরা। ছোট্‌কা একবার এ-বই একবার ও-বই করছে। আর আমাকে ধাঁধা বলে যাচ্ছে। আমার নিবিষ্ট চোখ খাতার দিকে।

শতদল বকসী, উমেশ তলাপাত্র, ললিত গুঁই, গৌরাঙ্গ মিত্র আর বিজন বিশী—এ-যুগের পাঁচ বাঘা ঔপন্যাসিক। গত পুজোয় এই পাঁচজনের পাঁচটি উপন্যাসের বই বেরিয়েছে। তাই নিয়েই এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

ব্যাপার হল, পাঁচজন লেখকের প্রত্যেকে তাঁর নতুন বই অন্য ঔপন্যাসিকের মেয়েকে উৎসর্গ করেছেন। পাঁচ ঔপন্যাসিকের পাঁচ মেয়েই একটি করে বই পেয়েছে। নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এ-রকমটা করা, কেননা একজনের নামে একাধিক বই উৎসর্গ করা হয়নি।

শতদল বকসী তাঁর উপন্যাসটি দিয়েছেন উমেশবাবুর মেয়ে ফুলরেণুকে। মনীষার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে উমেশ তলাপাত্রের বই। ললিতবাবুর বই পেয়েছে অসীমা, যূথিকা পেয়েছে গৌরাঙ্গ মিত্রের উপন্যাস। বিজন বিশীর বই পেয়েছে কল্যাণী।

কল্যাণী হল ললিতবাবুর মেয়ে।

মনীষার বাবা বই দিয়েছেন বিজন বিশীর মেয়েকে।

অসীমার বাবার নাম কী?

দ্বিতীয় ধাঁধা : কলকাতা, যাদবপুর ও বর্ধমান—এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে প্রবীণবাবুর তিন ছেলে। প্রত্যেকের বিষয় আলাদা।

বড় ছেলে যতীন কলকাতায় পড়ে না। দীপক বর্ধমানে থাকে না। কলকাতায় যে-ছেলে পড়ে তার বিষয় নয় ইতিহাস। বর্ধমানে যে পড়ে, তার বিষয় হল অঙ্ক। দীপক অর্থনীতির ছাত্র নয়।

আরেক ছেলের নাম তরুণ। সে কোথায় পড়ে এবং কী নিয়ে?

তৃতীয় ধাঁধা : ১০০টি সিকি আর আধুলিতে সাকুল্যে ৩১ টাকা রয়েছে আমার। সিকি আর আধুলির সংখ্যা আলাদাভাবে বার করতে হবে।

চতুর্থ ধাঁধা : ৪৫ থেকে ৪৫ বিয়োগ করে ৪৫ পাওয়া যায়। লিখে এমনটি দেখাতে পার?

গতবারের উত্তর। (১) মীরা যে গীটার বাজায়, বলাই আছে। বেহালা যে বাজায় সে ফরাসী ভাষা জানে। সুতরাং মীরার পক্ষে তিনটি ভাষা জানার সম্ভাবনা—স্প্যানিশ, ইটালীয়ান ও জার্মান। মীরা ইটালীয়ানও জানে না বলা ছিল। সুতরাং সম্ভাবনা কমে গিয়ে হল জার্মান ও স্প্যানিশ। বীণা এস্রাজ বাজায় না, গীটার বাজায় না, ফরাসী শেখেনি, সুতরাং বেহালাও জানে না। সুতরাং বীণা নিশ্চিত সেতার বাজায়। অনীতা বেহালা জানে না, সেতার বাজায় না, গীটারও নয়, সুতরাং অনীতার বাজনা হল এস্রাজ। লীলার বাজনা, সুতরাং, বেহালা। লীলার ভাষাও তাহলে ফরাসী।

অনীতা এস্রাজ বাজায়, ইটালীয়ান জানে না, স্প্যানিশ জানে না, ফরাসী ভাষা লীলার। সুতরাং অনীতার ভাষা হল জার্মান।। সেক্ষেত্রে, মীরার স্প্যানিশ। বাকী রইল ইটালীয়ান, বাকী রইল বীণা। বীণার ভাষাই ইটালীয়ান।

(২) ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠা (৩) শ্যামের ৮০ টাকা ও আমার ৬০ টাকা। (৪) হিজিবিজি নয়। ইংরেজী One, Two, Three, Four, Five, Six Seven -এর আদ্যক্ষর নিয়ে ওই বিচিত্র শব্দটি তৈরী। পরের তিনটি অক্ষর, তাহলে, E N T

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বলো তো

প্রঃ মানুষ কখন বাসন হয়?
উঃ যখন রেগে মুখ হাঁড়ি হয়।
প্রঃ কথা কখন খবর হয়?
উঃ যখন কথাবার্তা হয়।
প্রঃ কোন প্রাচীন শহরে হাতি ছিল না?
উঃ হস্তিনাপুর।
প্রঃ কোন দেশের সঙ্গে একটা ফুটকি জুড়ে দিলে একটা ভারতীয় ভাষা হয়?
উঃ কানাডা।
প্রঃ কোন্ শহরের সোনার কান ছিল?
উঃ কর্ণসুবর্ণ।
প্রঃ কোন্ বাক্স অলিম্পিকে গিয়েছিল?
উঃ গুরুবক্স (সিং)।
প্রঃ আকাশ কখন টুকরো টুকরো হয়ে যায়?
উঃ যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে।
প্রঃ রামায়ণে কার নাম দশটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি?
উঃ দশরথ।
প্রঃ মহাভারতের কোন্ রাজা মোটেই ছোট ছিলেন না?
উঃ বিরাট।
প্রঃ কোন রস কখনো দেওয়া হয় না কেবল আসে?
উঃ আনারস।
প্রঃ পায়সের পা বদলে গেলে সে কেন কা কা করে ডাকে?
উঃ বায়স হয়ে যায় যে!
প্রঃ কোন্ জায়গাকে একটা ছোট্ট ফল তাড়া করেছে?
উঃ জামতাড়া।
প্রঃ কোন বন্ধুটি নামে শান্ত কিন্তু খেলতে নেমে ঠিক তার উলটো?
উঃ প্রশান্ত মিত্র।

ডাইনোসর-চুরি

ডাইনোসর-চোরদের নাকের ডগা থেকে। চুরি হয়ে গেল ডাইনোসরটা।
ট্রাকটা যে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু চালাচ্ছে কে?

আরে, আমারই ত চালানোর কথা ছিল!

কুয়াশা-ঘেরা লন্ডনের রাতে...মনে হচ্ছে বিশাল এক প্রেতমূর্তি যেন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে!..
গাড়িটা তুমি ঠিকমত চালাতে জানো তো?
এ তো ঠিক একটা সাধারণ লরিরই মত!

তুমি লরি চালাতে জানো?
নিশ্চয়ই। যুদ্ধের সময় আর্মির একটা লরি চালিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে নূপ ওয়ান তাদের পিছু নিয়েছে...
ওরা আমাদের তাড়া করেছে!

আরো জোরে...ওরা নাগালের বাইরে চলে যাবে।
ঘাবড়াবেন না. ঠিক ধরে ফেলব!

হেটি, সাবধান, বড্ড কুয়াশা...

কিছুক্ষণ পরে...
তুমি ঠিক বলেছিলে... ওদের তো পাত্তাই পাচ্ছি না!
গাধা!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

স্কুলের ভেতরে এত সবুজ! চারিদিক-জুড়ে গাছপালা, গাছের পর গাছ, খেলার মাঠ, ধানক্ষেতে ধানচারা, বেগুনক্ষেতে বেগুন, মাটিতে লতানো পুঁই—যেন এক সবুজের পৃথিবী। সেই সবুজের ফাঁকে-ফোকরে ঝকঝকে-তকতকে স্কুলবাড়ি, কলেজবাড়ি, বাঁধানো রাস্তা, ছাত্রাবাস, বেদী-বাঁধানো 'আমতলা'। সেখানেও ক্লাস বসে।

যতই দেখি, ততই অবাক হই। শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, লেখাপড়াতেও নরেন্দ্রপুরের এই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় যে কত ভালো সে তো তোমরা জানোই। এবারকার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় এই স্কুলের ছেলে ফার্স্ট হয়েছে বলেই নয়, এখানকার সব ছাত্রই লেখাপড়ায় দারুণ ভালো। কী করে এটা সম্ভব হল?

প্রধান শিক্ষক স্বামী সুহিতানন্দ বললেন, "আমরা এখানে দশ-এগার জন সন্ন্যাসী আছি। শিক্ষাদানকে আমরা ব্রত হিসেবে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, আমরা বিশ্বাস করি, এতেই আমাদের মুক্তি।"

আমি বললাম, "আপনারা তো বাইরে থেকেও শিক্ষক নিয়োগ করেন, অধিকাংশ শিক্ষকই তো তা-ই, তাঁরাও কি আপনাদের মতো শিক্ষাদানকে ব্রত হিসেবে নেন?"

"তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি আমাদের মতো শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসীর আদর্শ দাবি না করলেও দুটো জিনিস দেখে নিই—তাঁদের শিক্ষা ও চরিত্র। ফলে শিক্ষকতা তাঁদের কাছে নিছক একটা পেশা হয়ে থাকে না। আর আমরা যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁদের জীবনে এখানকার ছাত্রদের গড়ে তোলাই একমাত্র ব্রত, চব্বিশ ঘণ্টার কাজ।"

শ্রদ্ধায় অভিভূত আমি কোনরকমে প্রশ্ন করি, "ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যাপারটাকে এই যে আপনারা জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন, তার ফলে নিশ্চয় আপনারা নিজেদের বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতিও গড়ে তুলেছেন—সেটা কী?"

মুণ্ডিতমস্তক, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী স্বামী সুহিতানন্দ বললেন, "এখানকার শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা আর ছাত্রদের মনে নিজেদের প্রতি আস্থা জাগানো। এখানকার শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। নিজের ভাইকে লেখাপড়ায় স্বভাব-চরিত্রে ভালো ছেলে তৈরি করতে দাদার যে-রকম নিষ্ঠা থাকে, এখানকার শিক্ষকরা সেই নিষ্ঠা, সেই ভালবাসা নিয়ে ছাত্রদের পড়ান, পরামর্শ দেন। তাই বলে শিক্ষক ছাত্রের হাত ধরে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে দেবেন, অঙ্ক কষিয়ে দেবেন, তা কিন্তু নয়। এটা একটা ভুল পদ্ধতি। অন্য স্কুল থেকে এখানে অনেক ভাল ছাত্র ভর্তি হতে আসে, তারা প্রথম থেকেই বাড়িতে মা-বাবা বা প্রাইভেট টিউটরের ওপর এত বেশী নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, পরে কারও সাহায্য ছাড়া এক পা চলতে পারে না; আমরা প্রথমেই তাদের এই পরের মুখ চেয়ে বসে থাকার ভাবটা ভেঙে দিই। আমাদের এই আশ্রম-বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আমরা প্রশ্ন করতে, স্বাধীনভাবে ভাবতে, বুঝতে, স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করি, উশ্‌কে দিই। এখানে যে-কোনও ছাত্র যখন খুশি যে-কোনও প্রশ্ন নিয়ে, সমস্যা নিয়ে শিক্ষকের কাছে চলে আসে, শিক্ষকও স্নেহবশে ছাত্রের সেই আবদার পূরণ করেন। আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন, ছাত্ররা আমার কাঁধে হাত রেখে আমার সঙ্গে কথা বলে।"

আমি বললাম, "কিন্তু সব ছেলেকে প্রথম সারির ছাত্র বানান কী করে?"

"প্রত্যেক মাসে আমরা ছাত্রদের পরীক্ষা নিই। পরীক্ষার ফলাফল রিভিউ করে সেইমতো তিনটে গ্রুপে তাদের ভাগ করি: প্রমিসিং, ডিটারিয়োরেটিং ও স্লো-লার্নার্স। তারপর যাদের যেমন দরকার সেইমতো এক-দেড়মাস বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করি। তাতেই শেষ দুই গ্রুপের ছেলেরা আরও জোরের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে ও সামনের সারির ছেলেদের ধরে ফেলতে সচেষ্ট হয়। আমরা আর-একটা কাজ করি। প্রত্যেক ছাত্রকে হোম-ওয়ার্কের ডায়েরি রাখতে হয়। ক্লাস টীচার সেগুলো দেখে একটা রিপোর্ট তৈরী করে বিভাগীয় প্রধানকে দেন। বিভাগীয় প্রধান সেটি পর্যালোচনা করে তার মতামত জানান সহকারী প্রধান শিক্ষককে। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পর্যালোচনা আমি নিজে আবার খতিয়ে বিচার করি। এভাবে কোন্ ছাত্রের কোথায় কোন্ ধরনের ঘাটতি, ঠিক কোন্ ধরনের সাহায্য তার দরকার, সেটা বুঝে নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করি।"

বিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখে অবাক হয়েছিলাম, প্রধান শিক্ষকের কথা শুনে আমি মুগ্ধ হই। আমার কল্পনা করতে ইচ্ছে করে, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে, এই আদর্শ শিক্ষক-মণ্ডলীর স্নেহে-শ্রমে লেখাপড়া শিখছে। তা তো হবার নয়। আমি স্বামীজীকে প্রশ্ন করি, "যেসব ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়বার

সুযোগ পায় না, লেখাপড়ায় ভালো হতে গেলে তাদের কীভাবে পড়া উচিত?"

স্বামী সুহিতানন্দের মুখে দুঃখের ছায়া পড়ে। বললেন, "শুধু উপদেশ দিয়ে কি কিছু কাজ হবে? তবে এইটুকু বলতে পারি, সারাদিন ঘ্যান-ঘ্যান করে মুখস্থ করবার চেষ্টা করে কিছুই লাভ হয় না। যেটা পড়ছে সেটা ভালো করে বোঝা দরকার। প্রাইভেট টিউটর, নোটবই—এসবের সাহায্য কোনও কাজে আসে না। এর ফলে ছাত্র কখনও স্বাবলম্বী হতে শেখে না। যে-ছেলে স্বাবলম্বী হতে চায়, তার উচিত হচ্ছে, যে-বিষয় পড়ছে সেই বিষয়ের ওপর অন্যান্য লেখকের আরও দু-একটা ভালো বই পড়া। ছাত্ররা ভয়ের ভাব ঝেড়ে ফেলে ভালবাসা নিয়ে বই পড়বার চেষ্টা করে দেখুক-না! দরকার ঠিকমতো বুঝে নেওয়া, তাতে ভয়ের কী আছে? আর, কয়েকটা ছোট জিনিস খেয়াল রাখা দরকার। যেমন বানান ভুল না করা, হাতের লেখা সুন্দর করা, ইত্যাদি। আপনাদের পত্রিকার গতবারের পূজাবার্ষিকীতে একটা লেখা দেখেছিলাম—'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'—ওই ধরনের পরামর্শ ভালো। ওতে ছাত্রদের কিছু ব্যবহারিক সুবিধা হয়। আমাদের ছাত্ররা ওটা পড়েছিল।"

কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

প্রধান শিক্ষক ঠিকই বলেছেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের **ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় দীপঙ্কর ভট্টাচার্য জানাল, গত বছর হেড এগজামিনারদের লেখা 'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়' সে পড়েছিল। বলল, "ওটা উঁচু ক্লাসের সকলের পক্ষেই ভাল হয়েছিল। এ-বছরও আপনাদের পত্রিকায় ওরকম কোনও লেখা থাকলে আমাদের উপকার হয়।"**

দীপঙ্কর জলপাইগুড়ির রেলওয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ছিল. এইট থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র। ক্লাস ওয়ান থেকে এ-পর্যন্ত কখনও সেকেণ্ড হয়নি, প্রত্যেক ক্লাসেই সে ফার্স্ট বয়। আমি বললাম, "সামনের বছর সেকেণ্ডারি পরীক্ষাতেও তুমি নিশ্চয় ফার্স্ট হতে পারবে?"

"আশা আছে, বিশ্বাসও আছে। পরিশ্রমও করছি, আরও করতে হবে।"

"রোজ কতক্ষণ পড়ছ?"

"আমাদের এখানে পড়ার সময় সকালে দু-ঘণ্টা, সন্ধেয় দুঘণ্টা। আমি এর ওপর রাতে আর দু-ঘণ্টা পড়ি। তাছাড়া স্কুল করি ন-টা থেকে বারোটা, দেড়টা থেকে চারটে।"

ঠিক কীভাবে পড়ছে জানতে চাইলে দীপঙ্কর বলল, "দিনে ছ-ঘণ্টা যে পড়ি, তার পাঁচ ঘণ্টাই লিখি। পড়ি ঘণ্টা-খানেক।"

"কী লেখো?"

"প্রত্যেক সাবজেক্টে বিভিন্ন বই কনসাল্ট করে নোট্স্ তৈরী করে রাখছি। এটা আমি নিজে করে শিক্ষকদের দেখাই। এভাবে লিখলে কত পারসেণ্ট নম্বর পেতে পারি সেটার একটা ধারণা পেয়ে যাই। সেইমতো লেখাগুলো সংশোধন করি। আর গ্রীষ্মের ছুটির পর থেকে টেস্ট পেপার সমাধান করছি।"

আমি বললাম, "কেমিস্ট্রির কথাই ধরা যাক। তুমি কী-কী বইয়ের সাহায্য নিচ্ছ?"

"স্কুলে বিজ্ঞান-পরিষদের 'ভৌত বিজ্ঞান' আর বিজয়কালী গোস্বামীর বই পড়ানো হয়। আমি তার ওপর লাডলীমোহন মিত্র ও পি কে দত্তর বই-ও পড়ছি। আমাদের লাইব্রেরিতে আরও অনেক বই আছে। তবে আমাদের যিনি কেমিস্ট্রি পড়ান তিনি এখানকারই ডিগ্রি কলেজের কেমিস্ট্রি-বিভাগের প্রধান। খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন।"

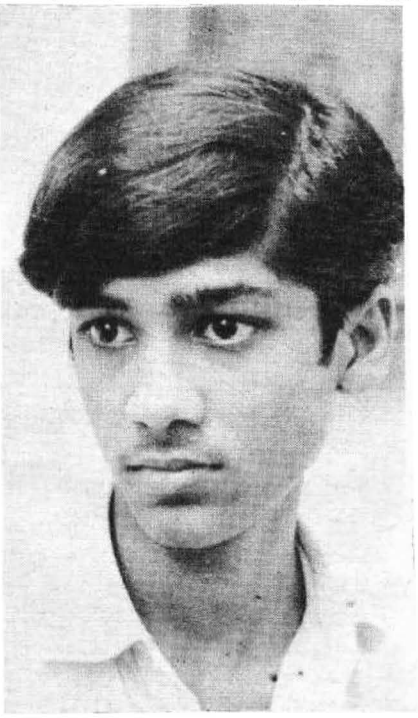

"ইংরেজীর বেলায় কী করছ?"

"টেক্সটে ৪০ নম্বর আছে। যে-কোনও জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। পুরোটাই আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ছি। গ্রামার তেমন ভালো লাগে না।"

"কোন্ কোন্ বিষয়ে বেশী জোর দিচ্ছ?"

"এখনও কোনও-একটা সাবজেক্টে বেশী জোর দিচ্ছি না, সবগুলোই সমান মনোযোগ দিয়ে পড়ছি। পরীক্ষার আগে কয়েকটা বিষয় বেছে নিয়ে জোর দিতে হবে।"

"কোন্ কোন্ বিষয়?"

"এখনও ঠিক করিনি। পরে সায়েন্সে যাব, না আর্টসে যাব, সেটা ঠিক করে সেইমতো বিষয় বাছব। তবে আমার ফ্যাসিনেশন আর্টসেই।"

মাসিক আনন্দমেলার নিয়মিত পাঠক ষোল বছরের ছেলে দীপঙ্কর ছুটিতে বছরে তিনবার জলপাইগুড়িতে তার মা-বাবার কাছে যাবার সময় পত্রিকাটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলে না। "মাসিক আনন্দমেলায় ওই যে অনেক ধরনের লেখা থাকে সেটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। ও-রকম তো আর নেই। হাসির খোরাক, ধাঁধা—ওগুলোও ভালো লাগে। 'লেখাপড়া' বিভাগটা তো খুব ভালো হয়েছে।"

আমি বললাম, "ছেলেবেলায় বাড়িতে তুমি কার কাছে পড়তে?"

"ছোটবেলা থেকে বাড়িতে পড়াশোনার ভালো পরিবেশ ছিল। বাবার কাছেই বেশী পড়েছি। বাবা যখন যেটা পড়াতেন, তার চারপাশের যা-কিছু জানবার, বোঝবার, সব সুন্দর করে বোঝাতেন। বাংলার প্রতি আমার আগ্রহ মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি।"

"সাহিত্য পড়তে ভালবাসো?"

"বাংলা সাহিত্য প্রায় সবই পড়ি। চমৎকার লাইব্রেরি আছে এখানে।"

"তুমি কি কিছু লেখো—প্রবন্ধ বা কবিতা?"

"প্রবন্ধ লিখতে ভালো লাগে।"

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

আগামী সংখ্যায় ॥ বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস' স্কুল

গাবলু

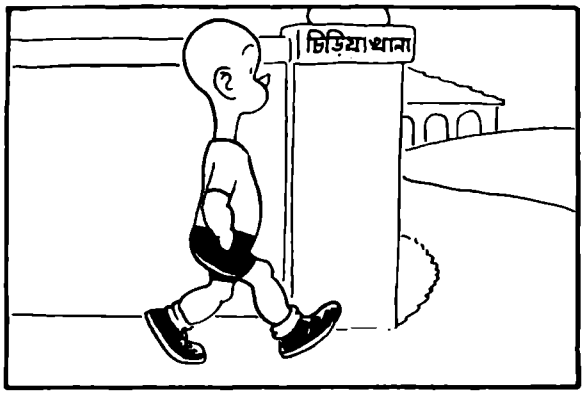

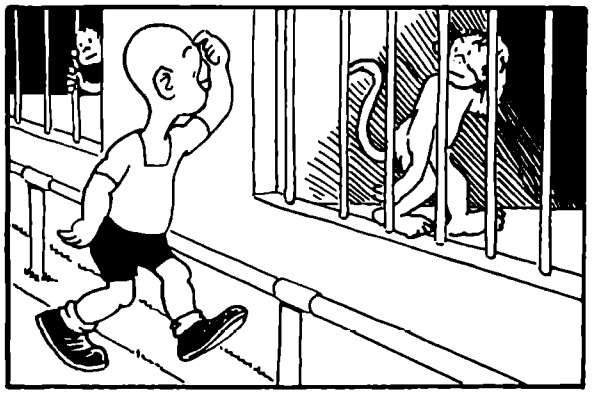

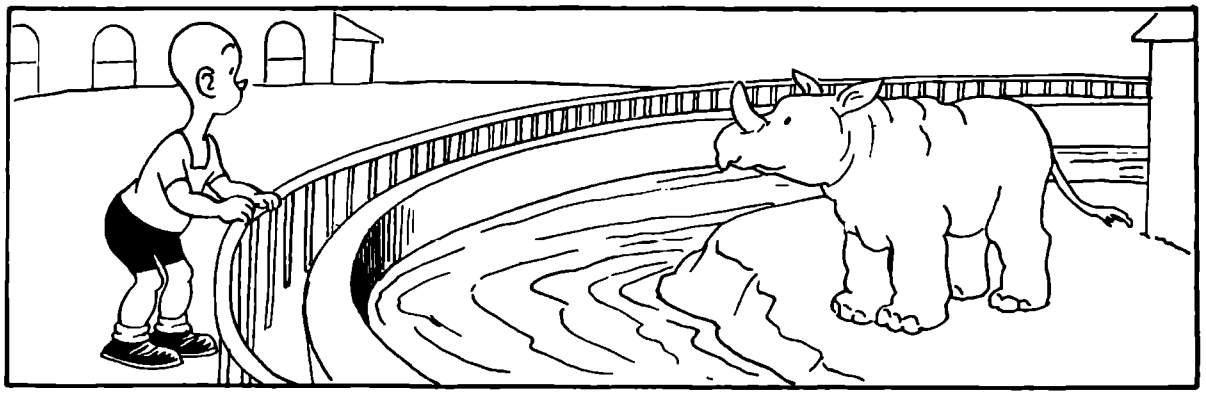

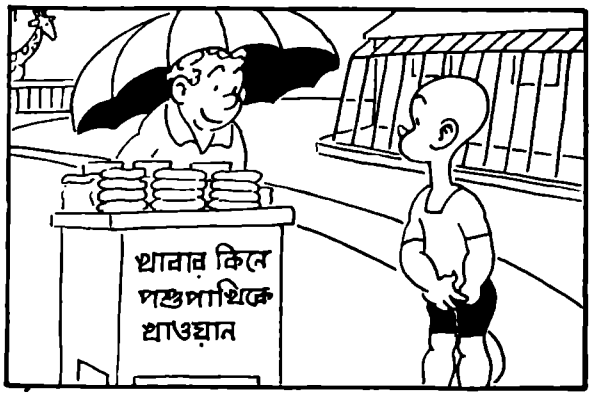

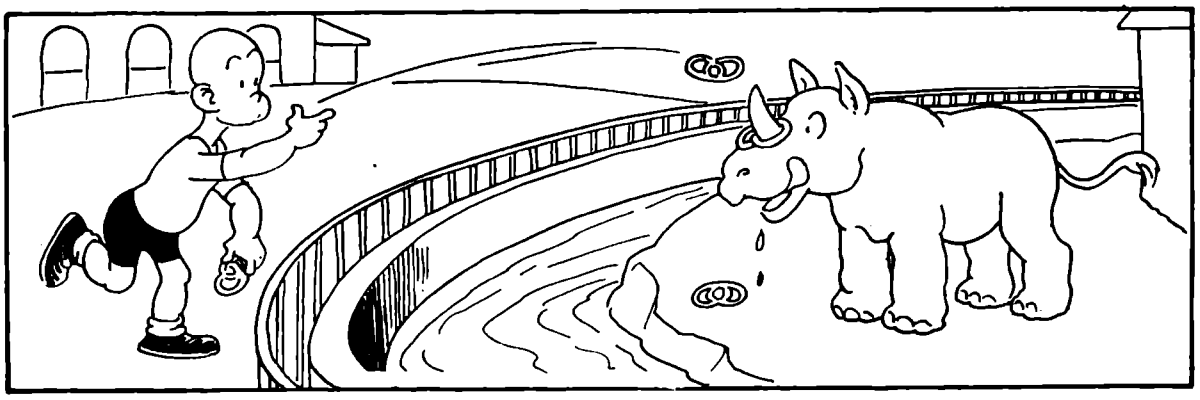

উপন্যাস

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে

মনোজদের বাড়িতে একটি অচেনা ছেলের ছবি আছে। ছবির ছেলেটাকে মনোজের খুব ভাল লাগে। ওদের বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। মাস্টারমশাই দুঃখহরণবাবু, উবু না হয়ে বসলে পড়াতেই পারেন না। একদিন একটা কাক ঠাকুমাকে ভীষণ জ্বালাতন করছিল। দেখে শুনে পুরুতমশাই বললেন, এ তো কাক নয়, নিশ্চয়ই আত্মা-টাত্মা। ওদিকে ঠিক তখনই গানের মাস্টারমশাই গণেশবাবু গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুঃখহরণবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় আর পারলেন না। গণেশবাবু দড়িটা এনেছিলেন গরুর গলা থেকে খুলে। সেই ছাড়া-গরুটা আদ্যাশক্তি দেবীকে ঢুঁসিয়ে ফেলে দিল গোবরের গর্তে। তাই নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-চৈ। এদিকে ওই কাকের মুখে সংস্কৃত শুনে পুরুতমশাই হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়ে ঢুকলেন হারাধনের ল্যাবরেটরিতে। সেখানে একটা জিনিস ছুঁতেই তাঁর টিকি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। মনোজের মেজোকাকা ভজহরিবাবু বাজার করতে ওস্তাদ। বাজারে গিয়ে তিনি মাছ কিনছেন, এমন সময় গোয়েন্দা বরদাচরণ তাঁকে বলেন, বাড়িতে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। তিনি এসে দেখেন, একটা কাক তাঁর দাদার পৈতে চুরি করে পেঁপেগাছে বসে আছে। বাড়ির চাকর রাম ইতিমধ্যে একটা মোষ ধরে এনে গোয়ালে বেঁধে রেখেছিল। রাখোবাবু যখন মনোজের গুলতি নিয়ে কাকটাকে তাক করছেন, তখন পাঁচিলের ওপর দেখা গেল বরদাচরণকে। একটু পরেই বরদাচরণ কাকের ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়লেন উঠোনে। তাঁর ছিটকে-পড়া পিস্তল লুকিয়ে পাচার হয়ে গেল পুতুলের পুতুল-খেলার বাক্সে। তিনি এসেছিলেন একটা পুরনো ফোটোগ্রাফের সন্ধানে, অথচ দুঃখহরণবাবুর ধারণা—তিনি এসেছেন মোষ-চুরির তদন্তে। তারপর—

৫

রাখোবাবু গুলতিটা হাতের কাছে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। বদমাশ কাকটা দেয়ালে বসে সব দিক নজর রাখছে। কখন গুলতিটার আবার দরকার হবে বলা যায় না, তারপর রাখোবাবু বরদাচরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিসের ফোটোগ্রাফের কথা বলছিলেন যেন?"

বরদাচরণ গলাটা নিচু করে বললেন, "অত জোরে কথা বলবেন না। চারদিকে শত্রুপক্ষ কান পেতে আছে।"

রাখোবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ফোটোগ্রাফ, শত্রুপক্ষ, এসব কী বলছেন বরদাবাবু?"

বরদাচরণ খুব বুদ্ধিমানের মতো একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "ঐ ফোটোগ্রাফটার সন্ধানে বহু গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

রাখোবাবু বললেন, "কেন, সেই ফোটোগ্রাফে কী আছে?"

"উঁহু, অত জোরে কথা বলবেন না।" বরদাচরণ সাবধান করে দেন। চারদিকে সতর্ক চোখে চেয়ে দেখে গলা নামিয়ে বলেন, "হরিণগড়ের নাম শুনেছেন তো?"

রাখোবাবু মাথা নেড়ে বলেন, "তা আর শুনিনি। সেখানকার রাজবাড়ি দেখতে গেছি কয়েকবার।"

বরদাচরণ বললেন, "হ্যাঁ, এই ফোটোগ্রাফটার সংগে সেই রাজবাড়ির একটা গভীর যোগাযোগ আছে।"

রাখোবাবু আগ্রহের সংগে বললেন, "কী যোগাযোগ বলুন তো!"

বরদাচরণ আবার সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আস্তে! সবাই শুনতে পাবে যে! ব্যাপারটা হল, হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণের একমাত্র ছেলে কন্দর্পনারায়ণ খুব অল্প বয়সে হারিয়ে যায়। সন্দেহ করা হয়, কন্দর্পনারায়ণকে কোনো দুষ্ট লোক চুরি করে নিয়ে যায়। সে প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কন্দর্পনারায়ণের খোঁজে হাজারটা লোক লাগানো হয়েছে, পুলিশ থেকে তো প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছেই। কিন্তু ছেলেটার খোঁজ পাওয়া একটু কঠিন হয়েছে, কারণ, কন্দর্পনারায়ণের যে-সব ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল সেগুলো রাজবাড়ির কয়েকটা অ্যালবামে লাগানো ছিল। কন্দর্পনারায়ণের সংগে-সংগে সেই সব অ্যালবামও উধাও। যারা কন্দর্পনারায়ণকে চুরি করেছে তারা খুবই চালাক লোক। তারা জানে, ছবি না থাকলে কন্দর্পনারায়ণের খোঁজ করা খুবই মুশকিল হবে। কেননা কন্দর্পনারায়ণকে তো আর সবাই দেখেনি। রাজবাড়িতে বা অন্য কোথাও যুবরাজ কন্দর্পনারায়ণের কোনো ছবিই নেই। ফলে যারা হারানো রাজকুমারের খোঁজ করছে তারা যাকে-তাকে রাজকুমার ভেবে ধরে-ধরে রাজবাড়িতে নিয়ে এসেছে এতকাল। এ পর্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার ছেলেকে এইভাবে রাজবাড়িতে হাজির করা হয়েছে। তাতে খুব গণ্ডগোল হয়। যে সব ছেলেদের ধরে আনা হয়েছিল তাদের বাপ-মাও এই নিয়ে খুব হৈচৈ করে। এদিকে রাজা গোবিন্দনারায়ণ, রানী অম্বিকা এবং রাজার মা মহারানী হেমময়ী রাজকুমারের জন্য পাগলের মতো হয়ে গেছেন। গত দশ বছর ধরে তাঁরা ভাল করে খান না বা ঘুমোন না। কিন্তু একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।"

পুরুতমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে পিছনে বসে শুনছিলেন। আর থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে উঠলেন, "কী ব্যাপার সেটা?"

হঠাৎ পিছন থেকে সতীশ ভরদ্বাজের গলা শুনে বরদাচরণ চমকে লাফিয়ে উঠে বললেন, "কে? কে? কে আপনি?"

বলতে বলতে বরদাচরণ অভ্যাসবশে পিস্তলের জন্য কোমরে হাত দিলেন।

রাখোবাবু বললেন, "ভয় পাবেন না বরদাবাবু, উনি আমাদের পুরুতমশাই। এতক্ষণ তো এখানেই বসে ছিলেন। দেখেননি?"

বরদাচরণ অবাক হয়ে বলেন, "না তো! উনি এখানেই ছিলেন?"

সতীশ ভরদ্বাজ রেগে গিয়ে বলেন, "হ্যাঁ বাপু, আগাগোড়া এখানে বসে আছি। তোমাকে পাঁচিলে উঠতে দেখলাম, কাকের তাড়া খেয়ে গাছের ডগা ভেঙে পড়তে দেখলাম। চারদিক লক্ষ করো না, কেমন গোয়েন্দা হে তুমি?"

বরদাচরণ পিস্তলের জন্য কোমরে হাত দিয়ে খুব অবাক। পিস্তলটা নেই। স্তম্ভিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এ কী! আমার পিস্তল?"

সতীশ ভরদ্বাজ ভয়ে আঁতকে উঠে বললেন, "পিস্তল খুঁজছ কেন বাপ? না, না, আমি তোমাকে অপমান করার

জন্য কিছু বলিনি। তুমি বড় ভাল গোয়েন্দা।"

বরদাচরণ বিরক্ত হয়ে বলেন, "আমি যে ভাল গোয়েন্দা সে আমি জানি। কিন্তু আমার পিস্তলটা কোথায় গেল?"

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, "বন্দুক পিস্তল বড় ভাল জিনিস নয় বাবা। গেছে তো যাক, ও নিয়ে তুমি আর ভেবো না, ওসব কাছে রাখলেই মানুষের মনে জিঘাংসা আসে।"

রাখোবাবুর আবছা মনে পড়ল, বরদাচরণের হাতে তিনি যেন পিস্তলটা একবার দেখেছিলেন। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বললেন, "আজ বোধহয় পিস্তলটা ভুলে এসেছেন।"

বরদাচরণ মাথা নেড়ে বলেন, "বলেন কী, পিস্তল আমার হাতের আঙুলের মতো অচ্ছেদ্য। পিস্তল ছাড়া কখনো বেরোই না। চারদিকে আমার অনেক শত্রু।"

"মানুষ মাত্রেই ভুল হয়," রাখোবাবু বলেন।

বরদাচরণ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বলেন, "এমন বিরাট ভুল জীবনে কখনো করিনি। যাকগে, কন্দর্পনারায়ণের কথায় আসি, কী যেন বলছিলাম?"

পিছন থেকে সতীশ ভরদ্বাজ বলে উঠলেন, "তুমি বলছিলে, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।"

বরদাচরণ কটমট করে সতীশ ভরদ্বাজের দিকে তাকিয়ে কঠিনস্বরে বললেন, "আপনি আড়ি পেতে আমার সব কথা শুনেছেন। কিন্তু খুব সাবধান এসব কথা যেন পাঁচ-কান না হয়।"

সতীশ ভরদ্বাজ মাথা নেড়ে বললেন, "ঘুণাক্ষরেও না, ঘুণাক্ষরেও না। গল্পটা বড় ভাল ফেঁদেছ। বলো তো শুনি।"

"গল্প নয়।" বলে বরদাচরণ আর-একবার পুরুত-মশাইয়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে ফের রাখোবাবুকে

বললেন, "হ্যাঁ, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত। সেটা হল, কন্দর্পনারায়ণকে চুরি করা হলেও খুন করা হয়নি। কন্দর্পনারায়ণ যেখানেই থাক, সে বেঁচেই আছে। কারণ, সে চুরি যাওয়ার পর থেকে প্রতি বছর গোবিন্দনারায়ণের নামে একটা করে চিঠি আসে। চিঠিগুলো লেখে কন্দর্পনারায়ণ নিজেই। কিংবা ছেলে-চোরেরা তাকে দিয়ে চিঠি লেখায়। তাতে শুধু একটা কথাই লেখা থাকে—বাবা, আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। ব্যস্, আর কিছু থাকে না। সাধারণত জানুয়ারি মাসেই চিঠি আসে। আর, চিঠিগুলো আসে কখনো দিল্লি থেকে, কখনো বোম্বে থেকে, কখনো এলাহাবাদ থেকে। চিঠিগুলোতে কন্দর্পনারায়ণের হাতের ছাপ থাকে। কাজেই সন্দেহ নেই যে, সেগুলো তারই লেখা।"

বারান্দায় রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তিনটে মুখ ঢুকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সরোজ, মনোজ আর পুতুল গল্প শুনছিল। কিন্তু ইস্কুলের সময় হয়ে যাওয়ায় মেজ কাকা ভজহরি এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন।

বরদাচরণ বললেন, "প্রতি বছর যে-সব জায়গা থেকে চিঠি আসে সে-সব জায়গায় লোক পাঠানো হয়, পুলিশকেও জানানো হয়। কিন্তু কন্দর্পনারায়ণের চেহারা কেমন সেটা না-জানলে তাকে খুঁজে বের করা তো সম্ভব নয়। তাই এখন কন্দর্প-নারায়ণের একটা ছবি খুঁজে বের করার জন্য রাজা গোবিন্দ-নারায়ণ আমাকে কাজে লাগিয়েছেন। রাজবাড়ির অ্যালবাম ছাড়াও কন্দর্পনারায়ণের আরো দু একটা ছবি থাকতে পারে কোথাও। সেই আশায় গোবিন্দনারায়ণ আমার সাহায্য চেয়েছেন। তাই আমি বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে ছোটো ছেলের ছবি খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি কারও কাছে এমন কোনো ছোটো ছেলের ছবি থেকে থাকে, যাকে কেউ চিনতে পারছে না তাহলে সেই ছবি রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করার হুকুম রয়েছে।"

রাখোবাবু বলে উঠলেন, "সে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।" বলেই ফের মাথা নেড়ে রাখোবাবু বলেন, "না না ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় কথাটা এখানে খাটে না, এটা হল গিয়ে ডোমবনে বাঁশকানা।"

সতীশ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, "ডোমবনে বাঁশকানা আবার কী? বলুন, বাঁশবনে ডোমকানা।"

"ঐ হল।" লজ্জা পেয়ে রাখোবাবু বলেন, "সারা তল্লাট জুড়ে বাচ্চা ছেলের ছবি খুঁজে বেড়ানো তো বিরাট ব্যাপার।"

বরদাচরণ বলেন, "ডিউটি ইজ ডিউটি। গোবিন্দনারায়ণ আমাকে এ কাজের জন্য মাসে পাঁচশো টাকা করে দিচ্ছেন। তাছাড়া, ছবি যার কাছে পাওয়া যাবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য যদি সেটা রাজকুমার কন্দর্পনারায়ণের আসল ছবি হয়।"

রাখোবাবু খুব হেসে বললেন, "হাসালেন বরদাবাবু। হরিণগড়ের রাজাদের আর্থিক অবস্থা আমি জানি। বছর দুই আগেও গিয়ে দেখে এসেছি, রাজমাতা হেমময়ী দরবার-ঘরের বাইরের দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছেন। আরও কী দেখেছি জানেন? দেখেছি, রাজা গোবিন্দনারায়ণ শশা খাচ্ছেন। আর রানী অম্বিকা বাগানের জঙ্গল থেকে কচুর শাক তুলছেন। এক হাজার টাকা পুরস্কার। হুঁঃ।"

এই বলে রাখোবাবু উঠে যাচ্ছিলেন।

বরদাচরণ বললেন, "সবটা শুনুন রাখোবাবু, তারপর না হয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন।"

সতীশ ভরদ্বাজও বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবটা শোনা

উচিত।"

রাখোবাবু মুখটা বিকৃত করে বললেন, "আপনি কী বলতে চান বরদাবাবু, যে রাজার মা ঘুঁটে দেয়, যার রানী কচুর শাক তোলে এবং যে রাজা নিজে শশা খায় সে পাঁচশো টাকায় গোয়েন্দা ভাড়া করবে আর একটা ছবির জন্য হাজার টাকা পুরস্কার দেবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য?"

বরদাচরণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, "শুনুন রাখোবাবু। রাজার মা যে ঘুঁটে দেন সেটা অভাবে নয়। সময় কাটানোর জন্যই তিনি ঘুঁটে দেন। রানী অম্বিকা কচুর শাক তুলছিলেন বটে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাঁদের অন্য তরকারি জোটে না। আসলে গোবিন্দনারায়ণের কচুর শাকের ওপর খুব রাগ। কিন্তু রানী নিজে কচুর শাক ভালবাসেন বলে চুপি-চুপি নিজেই তুলে নিয়ে গোপনে রান্না করে খান। আর শশা? হাঃ হাঃ। গোবিন্দনারায়ণের ডায়াবেটিস হওয়ার পর থেকে ডাক্তার তাঁকে কেবল শশা খেয়েই থাকতে বলেছেন যে! শশার মধ্যে চিনির ভাগ খুবই কম। আর এ তো সবাই জানে

গোবিন্দনারায়ণের রাজত্ব এখন না থাকলেও রাজবাড়ির হাজারটা সুড়ঙ্গ দিয়ে মাটির তলায় যে সব চোর কুঠুরিতে যাওয়া যায় সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার হীরে জহরত আর মোহর রয়েছে! অবিশ্বাস করবেন না রাখোবাবু, আমি এরকম একটা চোর কুঠুরিতে নিজে একবার ঢুকেছিলাম।"

সতীশ ভরদ্বাজ বলে উঠলেন, "সত্যি বলছ বাবা বরদাচরণ?"

"আমি মিথ্যে বলি না," বরদাচরণ গম্ভীরভাবে বলেন।

সতীশ ভরদ্বাজ বলেন, "তাহলে একবার আমার বাড়ি যাও তো। মনে পড়ছে, আমার বাড়ির কুলুঙ্গিতে একটা ছোট্ট ন্যাংটো ছেলের হামা-দেওয়া ছবি আছে। আমার ব্রাহ্মণী আবার সেটাকে গোপালের ছবি ভেবে পুজো-টুজো করেন। একবার দেখো তো সেই-ছবিটাই নাকি!"

ঠাকুরমশাইয়ের কথায় কেউ কান দিল না।

বরদাচরণ বললেন, "রাখোবাবু, গত বছর আপনার বাড়ির সামনের বাগান থেকে সরস্বতী পুজোর আগের দিন রাত্রে অনেক ফুল ও ফল চুরি যায়, খবর পেয়ে এসে আমি তদন্ত করে বের করি যে, সে সব ফুল ও ফল চব্বিশ পল্লীর ছেলেরা তাদের পুজোর জন্য চুরি করেছিল। মনে আছে?"

রাখোবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "তাতে মাথা কিনেছিলেন, আর কি! ধরে লাভটা কী হয়েছিল? তারা তো সে সব ফুল-ফল আমার গাছে এসে আবার লাগিয়ে দিয়ে যায়নি!"

বরদাচরণ গম্ভীরভাবেই বললেন, "এবং ওরা চুরি কেন করেছিল তাও আমি বের করেছিলাম। আপনি সেবার ওদের চাঁদা দেননি।"

রাখোবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "কেন দেব? চব্বিশ পল্লীর পুজো আপনার পাড়ায় হয়। বেপাড়ার পুজোর চাঁদা দেব কেন? আর এও বলে রাখছি, সে চুরির পেছনে আপনার হতচ্ছাড়া ভাগনে ঐ চাক্কুও ছিল।"

বরদাচরণ বললেন, "শুনুন রাখোবাবু, উত্তেজিত হবেন না। আমি সেই চুরির ব্যাপার আলোচনা করতে আসিনি।"

"তাহলে কি জন্য এসেছেন?"

"—যখন আমি এ বাড়িতে সেই চুরির ব্যাপারে তদন্ত করছিলাম তখন হঠাৎ আমার খুব জলতেষ্টা পায়। আমি পুতুলের কাছে এক গ্লাশ জল চাই। পুতুল তখন এই বারান্দায় বসে একটা ছবির অ্যালবাম খুলে তার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে ফোটোগুলো দেখছিল। সে অ্যালবাম রেখে জল আনতে গেল, তখন আমি আনমনে অ্যালবামটা তুলে ছবি-গুলো দেখছিলাম। তার মধ্যে একটা খুব সুন্দর চেহারার ছেলের ছবি ছিল। ছেলেটা একটা বাংলো-বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে আছে, তার পাশে একটা কাচের গ্লাশে দুধ রয়েছে। দুধটা একটা বেড়াল খেয়ে নিচ্ছে.....মনে পড়ছে আপনার? পুতুল জল নিয়ে এলে আমি তাকে ঐ ছবিটা কার তা জিজ্ঞেস করায় সে বলতে পারল না। আমি তখন মনোজ, সরোজ এবং ভজবাবুকেও জিজ্ঞেস করি। তারা কেউ কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু ছেলেটা দেখতে এত সুন্দর এবং

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিন্ত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে আমাদের যে কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

আমাদের ৫০০০৲ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পরে আপনি পাবেন ৬০,২৮৫.৬০ টাকা। তাছাড়া রয়েছে আমাদের ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট, এণ্ডাওমেণ্ট বেনিফিট ডিপজিট, মাসিক আয় সার্টিফিকেট, রেকারিং ডিপজিট এ্যাকাউণ্ট প্রভৃতি নানা সঞ্চয় প্রকল্প।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস

কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন ঃ ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)

॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

Progressive/UIB

ছবিটা এত রহস্যময় যে আমি ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি। আজ ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। কিছু যদি মনে না করেন তো আপনাদের ছবির অ্যালবামটা একটু আনুন, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে ঐ ছবিটাই কুমার কন্দর্পনারায়ণের।"

রাখোবাবু একটু হাঁ করে থেকে বলে উঠলেন, "তাই তো বরদাবাবু! তাই তো!" বলেই হঠাৎ উঠে চেঁচাতে লাগলেন—"রামু, রঘু, কিরমিরিয়া জলদি অ্যালবাম আন। জলদি।"

ডাক শুনে কিরমিরিয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডুকরে কেঁদে উঠল, "ও দাদাবাবু গো, আমি কিছু জানি না গো! আমি কিছু করিনি গো!"

রঘু 'জলদি' শুনতে 'জল' শুনে এক গ্লাশ জল নিয়ে পড়ি-মরি করে দৌড়ে এল। আর রামু তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনে গিয়ে লুকল।

যাই হোক, অনেক চেঁচামেচি, খোঁজাখুঁজির পর অ্যালবামটা পাওয়া গেল।

হাঁফাতে হাঁফাতে রাখোবাবু অ্যালবাম এনে পাতা খুলে ছবিটা খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে একটা পাতায় দেখা গেল ছবিটা যে-চারটে স্টিকারে লাগানো ছিল তা লাগানোই আছে, কিন্তু ছবিটা নেই।

রাখোবাবু হতাশ হয়ে বসে বললেন, "সর্বনাশ!"

বরদাচরণ অ্যালবামটা তুলে নিয়ে দেখলেন। মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ আস্তে করে বললেন, "রাখোবাবু, এখন আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে এ ছবিটাই ছিল কন্দর্পনারায়ণের ছবি।"

সতীশ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, "আমার ঘরে যে বাল-গোপালের ছবিটা আছে, বুঝলে বাবা বরদা, সেটাও—"

বরদাচরণ সতীশ ভরদ্বাজকে পাত্তা না-দিয়ে বললেন, "অ্যালবাম থেকে ছবিটা চুরি যাওয়াতেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অ্যালবামটা আমি নিয়ে যাচ্ছি রাখোবাবু, ফিঙ্গারপ্রিণ্টগুলো দেখতে হবে। আর বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদও করা দরকার।"

রাখোবাবু উদভ্রান্তের মতো চেঁচাতে লাগলেন, "সবাই এসো এদিকে। চলে এসো। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কড়কড়ে হাজারটা টাকা ফসকে গেল, ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? কোথায় গেল সরোজ, মনোজ, পুতুল?"

রঘু ভয়ে ভয়ে বলে, "খোকাখুকিরা ইস্কুলে গেছে।"

"ডেকে আন ইস্কুল থেকে।"

হারাধন তার ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গম্ভীরভাবে বলে, "কী হয়েছে বলো তো। ঐ বরদা ক্লাউনটা কোনো গোলমাল করছে নাকি?"

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে বলেন, "ক্লাউন কে তা আয়না দিয়ে নিজের মুখ দেখলেই টের পাবে হারাধন। আমি জরুরী কাজে এসেছি, ইয়ার্কি কোরো না।"

"হুঁ! জরুরী কাজ! কার বেড়াল চুরি গেল, কার বাগান থেকে কে লাউ নিয়ে গেল, কার গরু হারাল, এসব খুঁজে বেড়ানোই যার কাজ তার আবার ডাঁট কত!"

বরদাচরণ বলেন, "তবু ভাল, লাউয়ের সঙ্গে কুমড়ো মেশানোর চেষ্টা করে লোক হাসাইনি।"

রাখোবাবু দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "সবাই চুপ করো। শোনো সবাই, আমি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি বাড়ির লোককে। এর মধ্যে চুরি-যাওয়া ছবিটা খুঁজে বের করতেই হবে।"

(ক্রমশ)

ডোডো তাতাই

লেখা। তারাপদ রায়
রেখা। কৃত্তিবাস রায়

আশ্বিন মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু এ বছর এখনও বৃষ্টি শেষ হল না। আজ সকাল থেকে আকাশ অন্ধকার, মাঝেমধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে দমকা হাওয়া। হঠাৎ তাতাইবাবুর খেয়াল হল, এত বড় একটা বর্ষা চলে গেল, একদিন ভাল করে ছাতা ব্যবহার করা হল না। আলনার পাশে পুরো বর্ষা ধরে ছাতাটা মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে রইল, না বাবা, না কাকা, কেউ একদিন ছুঁয়ে দেখল না, অথচ এরা ছাতা হাতে না-থাকায় যথার্থই ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরেছে কত দিন, আর মার সেই রঙীন ছাতাটা যে কোথায় পড়ে আছে তারই পাত্তা নেই। এই সব অনাচার তাতাইবাবুর একেবারেই সহ্য হয় না, তাছাড়া আজ বিশেষ সুযোগ পাওয়া গেছে, বড়রা কেউই বাসায় নেই।

কিন্তু একটা ছাতা খোলা খুব সোজা ব্যাপার নয়, বিশেষ করে জীবনে প্রথমবার একা-একা ছাতা খোলা রীতিমত অসম্ভব কাজ। আরও ছোটবেলায় তাতাইবাবুর একটা রঙীন ছাতা ছিল, তবে সে ছাতা সব সময়েই বড়রা খুলে দিয়েছে। আজ তাতাইবাবু নিজেই একটা বড় ছাতা খুলতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন। একটু চেষ্টা করে, দুবার ছাতার কলে আঙুলে চিমটি খেয়ে বাধ্য হয়ে তাতাইবাবু পাশের বাড়ি থেকে ডোডোবাবুকে ডেকে আনলেন। দেখা গেল ডোডোবাবু এ-বিষয়ে এক্সপার্ট, এক সেকেন্ডে এমনভাবে ছাতা খুলে ফেললেন যেন জন্মানোর পর থেকে শুধু ছাতাই খুলছেন। মুহূর্তের মধ্যে খোলা ছাতা মাথায় দিয়ে তাতাইবাবু ছুটে রাস্তায় নেমে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ার এক ধাক্কায় পিছল রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন, ছাতাটা উড়ে চলে গেল দশ হাত দূরে। ডোডোবাবু হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন, 'ছত্রপতি তাতাইবাবু চিৎপাত।' তাতাইবাবু উড়ন্ত ছাতা ধরতে যাবেন না ডোডোবাবুকে তাড়া করে যাবেন ভাববার আগেই তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে আরেকবার ভূপতিত হলেন।

মাসটা কার্তিক

দিদিমণি

সবে দুর্গা পুজো শেষ হয়েছে, নতুন জামা কাপড়গুলোর নতুন-নতুন গন্ধ এখনও যায়নি, পুরোনো হয়ে মলাট ছিঁড়ে যায়নি রঙীন পুজো-সংখ্যা পত্রিকাগুলোরও। এদিকে স্কুল খোলারও তো সময় হয়ে এল, সামনেই বার্ষিক পরীক্ষার চোখ রাঙানি। পড়া তো বিশেষ কিছুই হয়নি পুজোর হৈ-হট্টগোলে—ভয়ে বুকটা দুরদুর করছে। তাই না? তবু সামনে আছে এখনও দুটি আনন্দের দিন—কালীপুজো আর ভাইফোঁটা। নানান রকম বাজি, পটকা আর আলোর মালাতে কালী পুজোর আনন্দও কিছু কম নয়। অনেক জায়গায় তুবড়ি প্রতিযোগিতা হয়। কার বানানো তুবড়ি কতটা উঁচুতে উঠে কতক্ষণ ফুলঝুরি ঝরায় তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা। অনেকেই বাজারের কেনা বাজিতে সন্তুষ্ট না হয়ে বাড়িতে মাটির খোলা কিনে তার মধ্যে নানা মশলা ভরে নিজেরাই তুবড়ি তৈরি করে নেয়। এই সব বাজির মধ্যে ফুলঝুরি আর রঙমশালই সবচেয়ে নিরাপদ।

বিপজ্জনক বাজি পোড়াতে গিয়ে অনেক সময়েই দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেইজন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওই সব বাজি নিয়ে মাতামাতি না করাই ভাল। কালীপুজোর পরে আছে ভাইফোঁটা। বাঙালীর ঘরে-ঘরে এটা একটা বড় সুন্দর উৎসব। ভাইয়ের কপালে বোন মঙ্গল টিপ পরিয়ে দেয়, তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। ভাই বয়েসে বড় হলে বোনকে আশীর্বাদ করে, আর ছোট হলে করে প্রণাম। ভাইবোন দুজনেরই মনে এইদিন খুব আনন্দ। এছাড়া আরও অনেকগুলো পুজো আছে এই মাসে—যেমন, জগদ্ধাত্রী পুজো, কার্তিক পুজো ও রাস। অনেক জায়গায় এই সব পুজো উপলক্ষেও ধুমধাম কিছু কম হয় না।

ক্রমশই দিনের চেয়ে এখন রাত্তির বড় হতে আরম্ভ করেছে। ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে সুতী চাদরটা টেনে নিতে হয়। আস্তে আস্তে শীত এগিয়ে আসছে, তবে শরৎ এখনও বিদায় নেয়নি। বিসর্জনের বাজনা বেজে গেলেও এখনও শিউলি, স্থলপদ্ম, জবা আর রেল লাইনের ধারে গ্রামের জলা মাঠে কাশ ফুলের সমারোহ। আকাশ এখনও উজ্জ্বল নীল, রোদ্দুর সোনালী। এবারে দুর্গা পুজো অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছু আগে হয়ে গেছে, তাই পুজোর শেষেও প্রকৃতি খুলে ফেলেনি তার উৎসবের সাজসজ্জা, শহরের একটু বাইরে গেলেই দেখা যাবে মাঠে-মাঠে সবুজ ধান উপচে পড়ছে।

রাত্তিরে আকাশে ঝলমল করে তারা আর ছায়াপথ, শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো যেন তরল সোনা। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে আকাশও যেন উদ্‌যাপন করছে তার দীপাবলি উৎসব। আকাশে এখন উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে গেছে ছায়াপথ। বৃশ্চিক রাশি প্রায় দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেছে, পূর্ব আকাশে দেখা দিয়েছে বৃষরাশি। বৃষরাশির কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারেই এই মাসের নাম হয়েছে কার্তিক।

টিনটিন বোম্বেটে জাহাজ

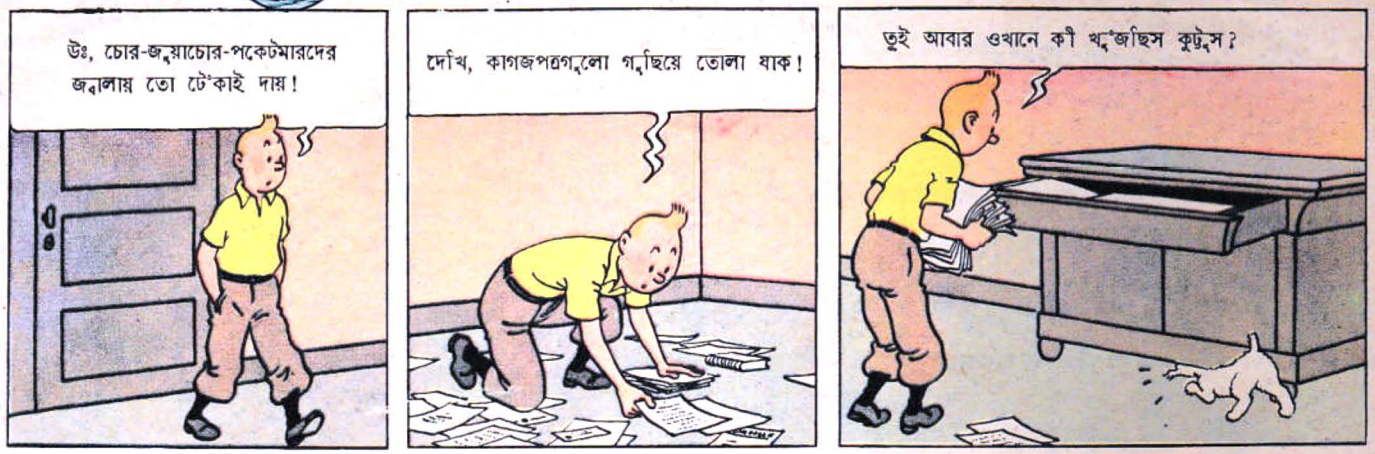

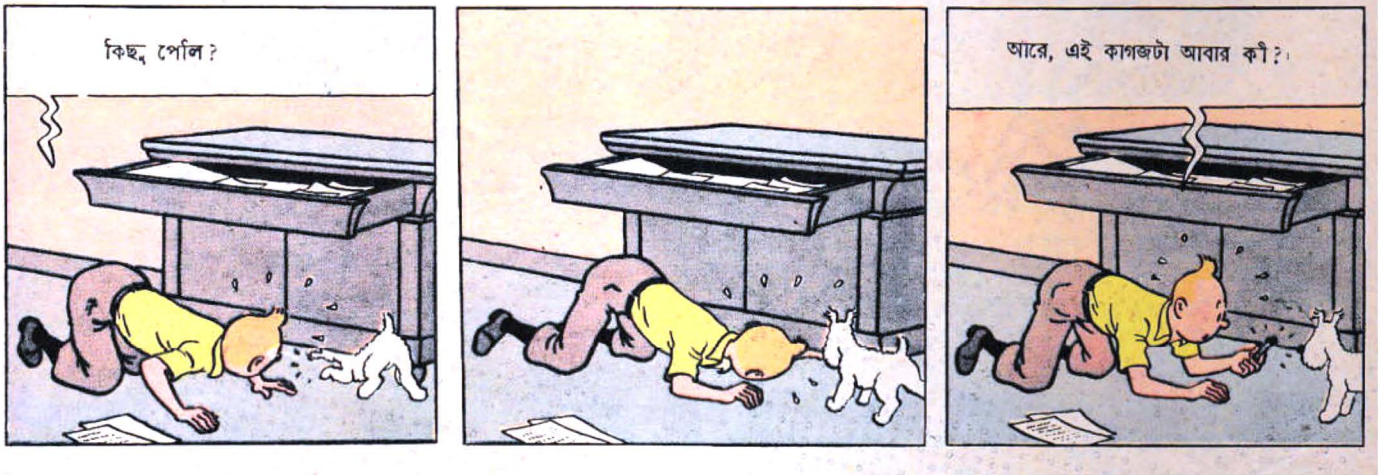

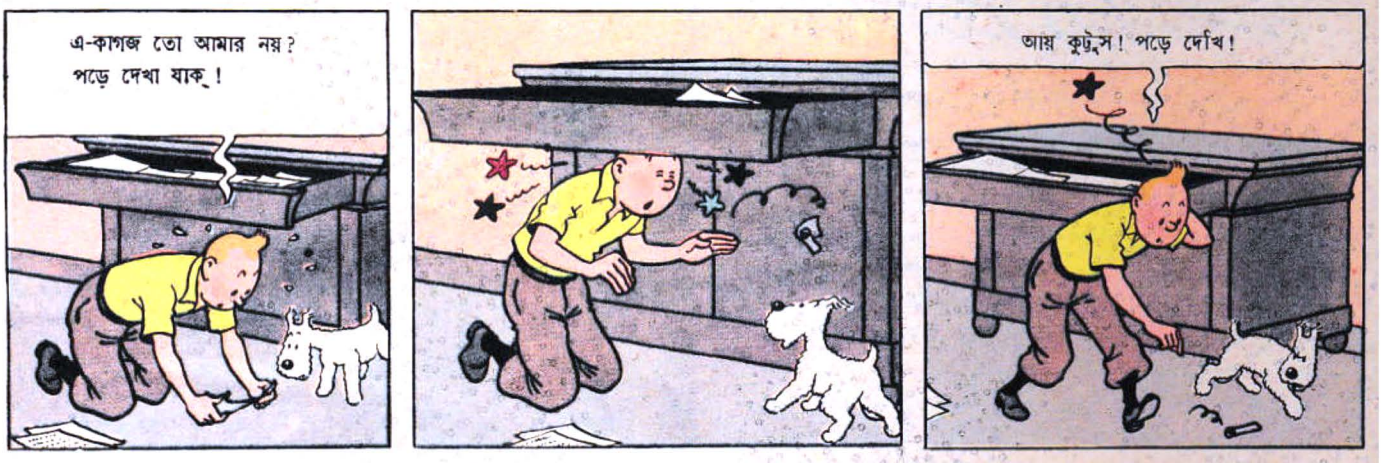

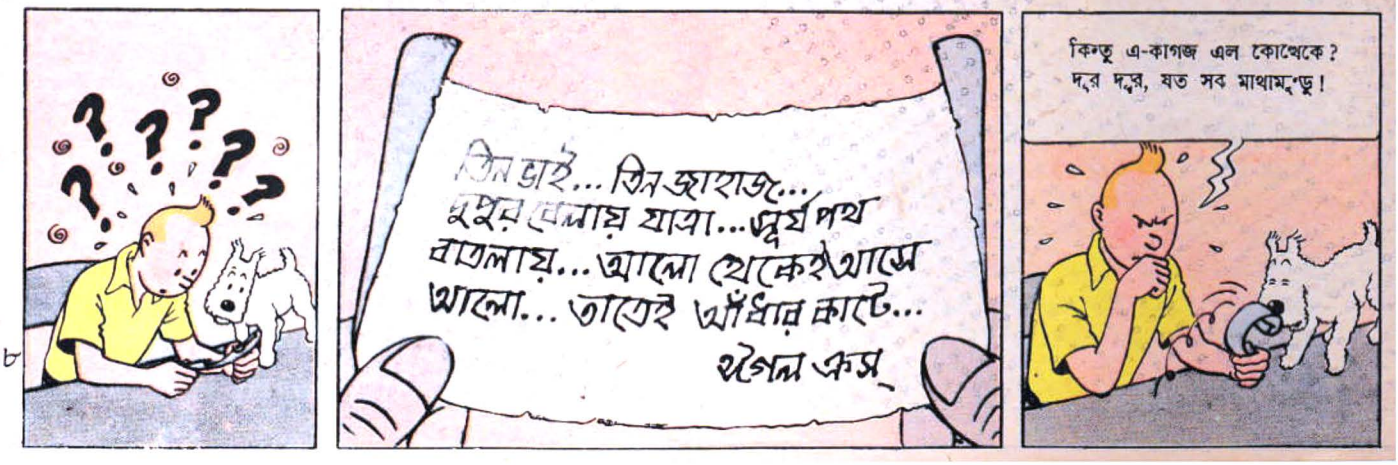

বুঝেছি! এই পাকানো কাগজ জাহাজের মাস্তুলে লুকোনো ছিল! মাস্তুল ভাঙবার পরে এটা গড়িয়ে দেরাজের তলায় চলে যায়!

হুঁ...জাহাজটা যে চুরি করেছে, সে এই লুকোনো কাগজের কথাও জানত! কাগজটা না-পেয়ে সে-ভাবে, সেটা আমি সরিয়ে রেখেছি। তাহলে তারই খোঁজে সে আবার এখানে এসেছিল!

টিনটিন, তুমি দেখছি পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠলে!

কিন্তু চোর এই কাগজের টুকরোটা পেতে চাইছে কেন? কী আছে এর মধ্যে?

হুঁ, পেয়েছি! যা ভেবেছি, তাই!

চল্ কুটুস, ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়া যাক!

কেন, আবার কী হল?

গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছি! চল্ চল্!

রিরিরিং... রিরিরিং রিরিরিং...

HADDOCK

নিশ্চয় গুপ্তধন!

ক্যাপ্টেন কি এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে?

RRRING

নাকি কোথাও বেরিয়ে গেল?

দেখি, ওর বাড়িউলীকে জিজ্ঞেস করি।

ক্যাপ্টেন হ্যাডক? না, তাঁকে তো বেরোতে দেখিনি! কেউ সারা দিচ্ছে না? আশ্চর্য!

অসুস্থ নয় তো?

তা হতে পারে। সারা রাত্তির ওঁর ঘরে আলো জ্বলেছে!

তাহলে দেখাই যাক!

রিরিরিরিরিং

উত্তর নেই?

একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি.....

এর পর বিয়াল্লিশের পাতায়

ভাবতে পারো?

রিপলি

সুইজারল্যাণ্ডের লাক মেইনেট্ নামের এই পঙ্গু মানুষটি বেশ কয়েকবার চোদ্দ হাজার সাত শ আশি ফুট উঁচু ম্যাটারহর্ন পাহাড়-চূড়ার প্রায় শীর্ষদেশে উঠেছেন। প্রতিবারই তাঁর পরনে ছিল একটি ঝুল-কোট, আর কাঁধে কুড়ি পাউণ্ড ওজনের একটি তাঁবুর বোঝা।

পম্পাইয়ের ভস্মস্তূপের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল চৌকো ধরনের এই রোমান ক্যালেণ্ডারটি।

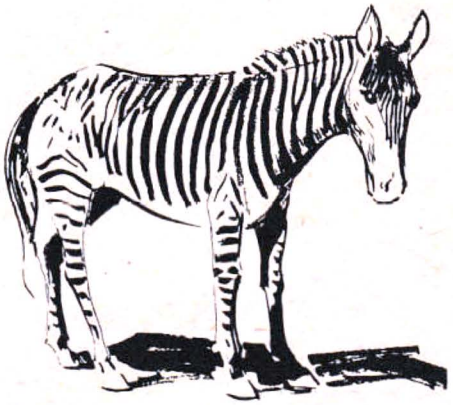

আরবী ঘোড়া আর জেব্রার বাচ্চা এই জেব্রয়েড্।

ছড়া

অনির্বাণ রায়

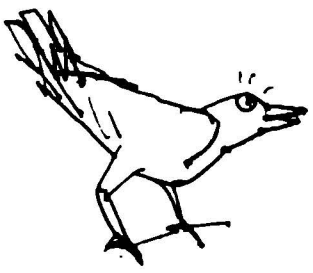

১

এক যে কাক
ডাকিয়ে নাক
বলছে ঘোড়া
আউর থোড়া
পরোটা খাক্'।

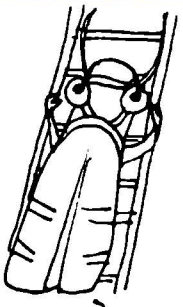

২

আরশোলা
চার তোলা
দিশি মিশি খেয়ে
চটপট
গটগট
ওঠে সিঁড়ি বেয়ে।

৩

শিলিং শিলিং
শিলং
ছুঁড়ছে খোকা
ঢিলং।

মিলিং মিলিং
মিলং
একটি বোকা
চিলং।

ও কোথায় গেল

টুম্পি সেদিন তার পুতুলের সংসার সাজিয়ে বসেছে। এরা সবাই এখন তার ছাত্রী। আমার ঘর এখন তার ছাত্রীদের দখলে, আমি কোনোরকমে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি। টুম্পি খুব ব্যস্ত, আজ তার পুতুলের ইস্কুলে প্রাইজ দেওয়া হবে, তারই আয়োজন চলছে।

প্রাইজ দেবে কে রে?

তাকিয়ে দেখো না। লেখাই তো আছে।

টুম্পির কথামতো তার স্লেটের দিকে তাকাই। টেবিলের ওপর দাঁড়-করানো স্লেটে লেখা আছে : সভায় পৌরহিত্য করিবেন শ্রীযুক্ত নন্তুবাবু।

জিজ্ঞেস করি : টুম্পি, ও কোথায় গেল?

এসে যাবে এক্ষুনি।

বলতে না বলতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন নন্তুবাবু, আর অমনি টুম্পি. আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো, বললাম না যে এসে যাবে এক্ষুনি?

শুনে আরো একবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি : টুম্পি, ও কোথায় গেল?

খুব রেগে গেল টুম্পি : কী হচ্ছে কাকু? খেপাচ্ছ, না?

না রে, খেপাচ্ছি না। বলছি যে, ওইখানে একটা ও-কার লাগবে না? 'পৌরোহিত্য' করাই কি ভালো নয়? ওখান থেকে 'ও' খসে পড়ল কেমন করে?

এই রে! আবার বানান!—বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল নন্তু।

টুম্পি কিন্তু বানানের খেলায় মজা পেয়ে গেছে। ওকে তেমন রাগী দেখাল না। বরং একটু লজ্জা-লজ্জা-ভাব করে বলল, ভুল লিখেছি বুঝি? জানি না বাবা—

জানবি না কেন? নিশ্চয় জানিস। ভাবিস না একটুও, এই যা মুশকিল। আচ্ছা লেখ্ তো, পুরোহিত।

বড়ো বড়ো করে লিখল টুম্পি : পুরোহিত।

তাহলে? জানিস না বললি কেন? পুরোহিত তো লিখলি ঠিকই। তাহলে পৌরোহিত্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ও-টা পালায় কোথায়? নন্তুর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে যায়?

গম্ভীর চালে নন্তু বলল : কিন্তু পুরোহিতেও যদি ও কারটা না দেয় কেউ, তাহলে কী হবে?

তাহলে? তাহলে পুরো হিত হবে না। শব্দটা কী করে হলো বল্? পুরঃ আর হিত। সন্ধিতে ওই বিসর্গটা ও হয়ে যায়। এ তো সোজা নিয়ম। যেমন ধর্, সরোবর মনোভাব মনোযোগ...

টুম্পি চোখ বড়ো করে বলে : এসবের মধ্যে বিসর্গ আছে না কি?

নেই? ভুলে গেলি সরস্বতীর কথা? সরঃ মনঃ অহঃ—এই-রকম তো শব্দগুলো?

অহঃ-টা কী?

দিন, দিন। যার থেকে হলো অহোরাত্র।

তার মানে বিসর্গ থাকলেই একটা ও-কার হবে, এই তো হলো ব্যাপার? বুঝেছি।

না, অত চট্ করে বুঝো না। বিসর্গের পরে কী আছে, সেটাও একটু দেখতে হবে। ক খ যদি থাকে, কিংবা চ ছ, কিংবা ট ঠ, ত থ, প ফ—তাহলে আর হবে না।

বাবা, অত কি মনে রাখা যায়?

কেন যাবে না? দেখছিস না, প্রত্যেকটা বর্গের প্রথম দুটো বর্ণের কথা বললাম?

বর্গ আবার কী?

তাও জানিস না? মহা মুশকিল হলো। ক খ গ ঘ ঙ, এই হলো ক-বর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ, এই হলো চ-বর্গ। এইরকম ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ।

টেবিলের ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে নন্তু বলে, আমি এখনো বুঝতে পারলাম না যে ব্যাকরণটাই বেশি খারাপ না ভূগোলটা।

তোর পক্ষে দুটোই সমান। ব্যাকরণে ব্যা করিস, ভূগোলেতে গোল।

টুম্পি তখনো ব্যাকরণে মজে আছে। বলল, ভূগোল আর গোলে কোনো যোগ আছে কাকু?

আছেই তো। সেটা ভুলে যায় বলেই অনেকে ভৌগোলিকের ও-কারটাকে লোপাট করে দেয়। ভূ আর গোল। আবার সেই গোল থেকে ধর্, গোলক।

গোলোকধাম?

না না। সে আবার আরেক জিনিস। সেটা হলো 'লোক' থেকে। ইহলোক পরলোক বলিস না? সেইরকম, দ্যুলোক ভূলোক গোলোক অলোক।

অমনি গলা মেলাল নন্তু : ওই-যে তুই গাইছিলি না? অলোকে কুসুম না দিয়ো—

ওঃ, এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। অলোক তো আর এ-লোকে নয়, সেখানে কুসুম দেবে কী করে? ওটা হলো চুল, অলক, অলক।

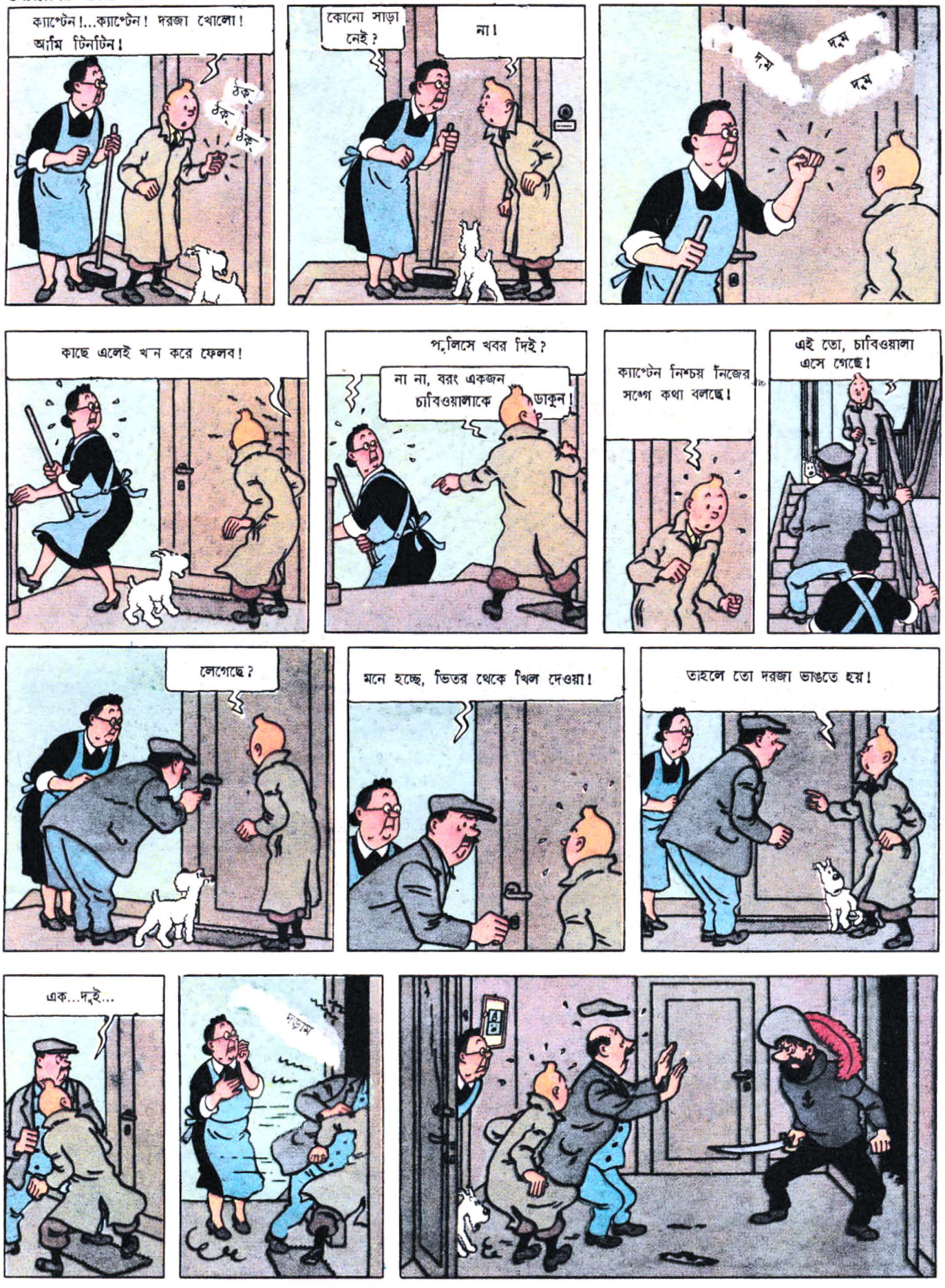
ক্যাপ্টেন!...ক্যাপ্টেন! দরজা খোলো! আমি টিনটিন!
ঠক্ ঠক্ ঠক্
কোনো সাড়া নেই?
না।
দম্ দম্ দম্
কাছে এলেই খুন করে ফেলব!
পুলিসে খবর দিই?
না না, বরং একজন চাবিওয়ালাকে ডাকুন!
ক্যাপ্টেন নিশ্চয় নিজের সঙ্গে কথা বলছে।
এই তো, চাবিওয়ালা এসে গেছে!
লেগেছে?
মনে হচ্ছে, ভিতর থেকে খিল দেওয়া।
তাহলে তো দরজা ভাঙতে হয়!
এক...দুই...
দড়াম

এর পর আগামী সংখ্যায়

ম্যাজিক ! ম্যাজিক !

জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

এবারে যে ম্যাজিকটা তোমাদের শেখাব, সেটা একটু অভ্যাস করে দেখালে সকলের মনে হবে যেন মন্ত্র দিয়ে হচ্ছে। মনে আছে, খেলাটা যখন আমি প্রথম বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়েছিলাম তখন তারা ভেবেছিল আমি নিশ্চয়ই জাদুমন্ত্র দিয়ে এটা দেখাচ্ছি, এবং এতে কোনও কৌশলই থাকতে পারে না।

প্রথম থেকেই বলছি। এক প্যাকেট তাস দর্শকদের হাতে দিয়ে সেটা ভাল করে মিশিয়ে দিতে বলা হল। দর্শকেরা মিশিয়ে দেবার পর জাদুকর পুরো প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বললেন, "আমি খুব তাড়াতাড়ি এই তাসগুলোকে একটু দেখব আর ঐ একবার দেখলেই তাসের কোন্‌টা কোথায় রয়েছে তা আমার মুখস্থ হয়ে যাবে।" এই বলে জাদুকর তাসগুলোর ওপর খুব তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ সব মুখস্থ হয়ে গেছে।" এরপর জাদুকর পুরো প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রেখে দর্শকদের একজনকে বললেন তাসগুলোকে চারভাগে ভাগ করতে। প্রথমে দুভাগ আর তারপর তার থেকে আবার দুভাগ দুভাগ করে মোট চারভাগ। দর্শক ঐ ভাগ তাঁর ইচ্ছেমতো জায়গা থেকেই করছেন। এবার জাদুকর বললেন, "দর্শকরা যেখান থেকেই ভাগ করুন না কেন, কোন্‌ তাস কোথায় আছে তা জাদুকরের জানা।" এই বলে তিনি ঐ চারভাগ তাসের ওপরের তাসগুলোকে একের-পর-এক বলে যেতে লাগলেন। ধরা যাক্‌ প্রথম অংশের ওপরের তাসটাকে তিনি বললেন 'ইস্কাবনের টেক্কা'. তারপর সেই তাসটাকে হাতে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন 'হরতনের সাহেব', সেটা হাতে তুলে নিয়ে তৃতীয় অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন 'রুহিতনের পাঁচ' আর তারপর সেটাকে হাতে নিয়ে শেষ অর্থাৎ চতুর্থ অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন, 'চিরেতনের নয়'। সেটাকেও তিনি হাতে তুলে নিয়ে, চারটে তাসই দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন। অবাক কাণ্ড! সত্যি-সত্যিই জাদুকরের হাতে ইস্কাবনের টেক্কা, হরতনের সাহেব, রুহিতনের পাঁচ আর চিরেতনের নয়ই রয়েছে।

তোমরাও নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ। ভাবছ বাহাদুরটা তাসের কোনটা কোথায় রয়েছে, তা মুখস্থ করা নিশ্চয়ই মহা কৃতিত্বের ব্যাপার। আসলে কিন্তু তাসগুলো মুখস্থ করার কোনও ব্যাপারই নেই। এটা আসলে একটা ছোট্ট কিন্তু মজার কৌশলে হচ্ছে। জাদুকর যখন তাসগুলোকে মুখস্থ করবার জন্য দেখছিলেন, তখন আসলে তিনি প্যাকেটের সবচেয়ে ওপরে কোন্‌ তাসটা রয়েছে শুধু সেটাই খেয়াল রেখেছিলেন। প্যাকেটের সবচেয়ে ওপরে ছিল ইস্কাবনের টেক্কা। এবারে দর্শক যখন ঐ প্যাকেটটাকে চার ভাগে ভাগ করলেন—অর্থাৎ প্রথম দুভাগ আর তারপর তার থেকে আরও দুভাগ করলেন তখন শুধু খেয়াল রাখতে হবে কোন্‌ ভাগের ওপরে ইস্কাবনের টেক্কা তাসটা রইল। আর সেই অংশটার কাজ একদম শেষে করতে হবে। এবারে জাদুকর অন্য একটা ভাগের ওপরের তাসটা ছুঁয়ে বললেন, "এটা হচ্ছে ইস্কাবনের টেক্কা।" আসলে কিন্তু সেটা মোটেই তা নয়। কিন্তু জাদুকর ঐ 'ইস্কাবনের টেক্কা' বলেই তাসটাকে হাতে তুলে নিলেন। হাতে নিয়ে জাদুকর তাসটা দেখলেন, সেটা আসলে হয়তো হরতনের সাহেব। এবার জাদুকর দ্বিতীয় একটা অংশের ওপরের তাসটা ছুঁয়ে বললেন, "এটা হচ্ছে হরতনের সাহেব", এবং সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন আসলে সেটা হচ্ছে রুহিতনের পাঁচ। এই অনুযায়ী তৃতীয় অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন রুহিতনের পাঁচ। এবং সেটা দেখে চতুর্থ অংশের ওপরের তাসটাকে বললেন চিরেতনের নয়। আসলে কিন্তু সেটা হচ্ছে সেই ইস্কাবনের টেক্কা। জাদুকর এবার হাতের চারটে তাস একটু ফেটিয়ে সেগুলো দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন। সব কটা তাসই তিনি ঠিক ঠিক বলেছেন। তাঁরা তো আর এসব কারসাজি বা কৌশলের কথা জানবেন না, তাঁরা ভাববেন বোধহয় ঐ অসাধারণ মুখস্থ করে রাখার ফলেই জাদুকর সব কটা তাস না দেখে বলে দিতে পারলেন। জাদুকর যে একটা দেখে অন্যটা বলছেন, তা তাঁরা বুঝতেও পারবেন না। এক প্যাকেট তাস নিয়ে নিজে-নিজে অভ্যাস করে দেখো, কী সহজ অথচ চমৎকার ম্যাজিক এটা।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

রাক্ষুসে ব্যাং

রাক্ষুসে সাপের কথা তোমরা শুনেছ। এবার তোমাদের বলব রাক্ষুসে ব্যাংয়ের কথা। তোমরা সবাই জানো সাপেই ব্যাং খায়। কিন্তু ব্যাংও যে সাপ ধরে খেতে পারে—সেকথা শুনেছ কি? কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার মনে হলেও এটা সত্যি, ব্যাংয়েও কখনও কখনও সাপ ধরে খায়। আর এরাই হচ্ছে রাক্ষুসে ব্যাং।

রাক্ষুসে ব্যাঙ অর্থাৎ সাপখেকো ব্যাংয়ের চেহারা অনেকটা আমাদের দেশের কোলা ব্যাংয়ের মতো।

তবে কোলা ব্যাংয়ের সঙ্গে এদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল এই যে, এদের সামনের দু'পায়ের মাংসপেশীগুলি রবারের টায়ারের মতো শক্ত। চোখ দুটো দেখলে ছোট ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে যাবে—মনে হবে যেন সেটা ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পিছনের পায়ে রয়েছে এদের পাঁচটা করে আঙুল, কিন্তু সামনের পায়ে চারটে করে। গায়ের উপর থাকে কালো-কালো ফোঁটা। দক্ষিণ আমেরিকার গভীর জঙ্গলে এদের খুব বেশী পাওয়া যায়।

কোনও শিকার ধরতে হলে এরা এদের চোখ, রবারের টায়ারের মতো শক্ত দুটি হাত এবং লম্বা জিভকে কাজে লাগিয়ে থাকে। শিকার ধরবার আগে এরা শুধু সেই প্রাণীটির দিকে একবার তাকায় মাত্র। তারপর সামনের দু'হাত দিয়ে শক্ত করে জাপটিয়ে ধরে প্রাণীটিকে সটান মুখের মধ্যে চালান করে দিয়ে ফলার সারতে লেগে যায়।

রাক্ষুসে ব্যাং প্রায় চার-পাঁচ ফুট লম্বা সাপকেও কী করে আস্ত খেয়ে ফেলে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রথমেই সে তার লম্বা জিভটা বার করে সাপের মাথায় একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। অনেক সময় সাপও তার লম্বা লেজ দিয়ে রাক্ষুসে ব্যাংকে জড়িয়ে ধরে তাকে কাবু করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাক্ষুসে ব্যাং এতে কিছুমাত্র ঘাবড়ে না-গিয়ে আস্তে আস্তে সামনের হাত দুটো দিয়ে ঐ বাঁধন ছাড়িয়ে ফেলে। তারপর দু'দিন ধরে বসে সে দিব্যি ভালমানুষের মত ঐ সাপকে হজম করতে থাকে।

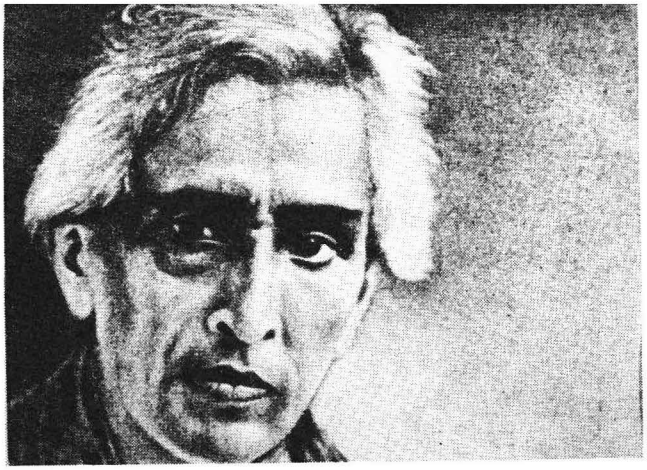

পশুপাখির সঙ্গে শরৎচন্দ্র

অরবিন্দ গুহ

'কানা' নামে শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় কুকুর ছিল। কানার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র ইংরেজীতে একটি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ভেলুর সঙ্গে কানা কিংবা আর কারও তুলনা হয় না। সকলের উপরে ভেলু। বর্মায় নগদ আট আনা পয়সা দিয়ে ওকে কেনা হয়েছে। শরৎচন্দ্র ভেলুকে পরম যত্নে বড় করেছেন।

চাকর-বাকরের সেবা ভেলু নেয় না। অতএব প্রভু শরৎচন্দ্রের উপরেই ভেলুর সেবার ভার। কিন্তু সেজন্য ভেলু প্রভুকে রেহাই দেয়নি, বহুবার শরৎচন্দ্রকে কামড়েছে।

শরৎচন্দ্র একদিন দুঃখ করে মণীন্দ্রনাথ রায়কে বলেছেন—মণি, ভেলো আমার সর্বনাশ করেছে—একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ভেলো একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে—একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কী বা বলব ওকে—ও বোধহয় বুঝতে পারেনি, বুঝলে কখনোই এ-কাজ করত না।

ভেলুর উপর শরৎচন্দ্রের অগাধ ভালোবাসা।

শরৎচন্দ্রের কাছে ভেলু বিস্তর চপ, কাটলেট ও রাজভোগ খেয়েছে।

কালিদাস রায় একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনার কাছে যা সুখাদ্য, ভেলির কাছে তাই সুখাদ্য হবে এটা মনে করেন কেন? ওর হয়তো পচা মাংস, মাছের কাঁটা ইত্যাদিই রাজভোগ। চপ কাটলেট সন্দেশের মর্যাদা ও কি বুঝবে?

শরৎচন্দ্র বললেন, "ঠাকুরকে তোমরা কী খেতে দাও? কী খাদ্য তিনি ভালোবাসেন তা কি তোমরা জানো? ঠাকুর কি তোমাদের তা বলেছেন?"

'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল ভেলুকে খাতির করতেন। সকলের জন্য চা আর জলখাবারের ব্যবস্থা। ভেলুও বাদ পড়ত না। শরৎচন্দ্র যেমন বলতেন ভেলুর জন্য তেমনি খাবার আসত।

একদিন শরৎচন্দ্র নিজের পেয়ালা থেকে পিরিচে চা ঢেলে দিয়েছেন। সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, "আমি চা খাই, ও আমার পানে যে-চোখে চেয়ে থাকে, দেখে মমতা হয়। বুঝি, ও একটু চায়। কাজেই যখনই আমি চা খাই, ওকে পিরিচে ঢেলে খানিকটা দিই।"

শৈলেশ বিশী একদিন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন। পবিত্র আগেই শৈলেশকে সাবধান করে দিয়েছেন—শরৎদার ঘরে ঢুকতেই একটা লোমশূন্য কুকুর তোমাকে ঘেউঘেউ করে তাড়া করে আসবে, চাই কি এক কামড় দিতেও পারে, তুমি একেবারে 'নট নড়ন-চড়ন' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ভেলু ঘেউঘেউ করে তেড়ে এল। ঘেউঘেউ করে শৈলেশের চারদিকে ঘুরে তাঁকে শুঁকতে লাগল। তারপর গেল শরৎচন্দ্রের কাছে। তিনি তখন ভেলুকে বললেন, "ওকে আসতে দাও, কিছু বোলো না।" ভেলু চুপ করল না, গরগর করতে লাগল। শৈলেশ বসলেন।

শরৎচন্দ্র তখন সবিস্তারে ভেলুর গুণ বর্ণনা আরম্ভ করলেন, "এই যে ভেলুকে দেখছ, এর মতো একটি শান্ত শিষ্ট কুকুর আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে কিনা একটু এ-রকম করে। একবার কী হয়েছিল জানো? রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল, ভেলু একতলার ছাদ থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে ঘ্যাঁচ করে কামড়ে তার পায়ের এক খাবলা মাংস তুলে নিল। তখন আমি কী করি, লোকটাকে ডেকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় করলাম। তারপর ভেলুকে পাঠালাম ট্রপিকালে—তার মুখের লালা পরীক্ষা করাতে। তাতে ভেলু পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এল। কিছু ভেবো না, ও যদি তোমাকে কামড়েও দেয়, জলাতঙ্ক রোগ হওয়ার তোমার ভয় নেই।"

এই ভেলুর মুখে, বিভূতিভূষণ ভট্টের চোখের সামনে, শরৎচন্দ্র একদিন চুমু খেয়েছেন।

শেষ বয়সে ভেলু বাড়িতে 'টেপী' নামে একটি সঙ্গিনী পেয়েছে। টেপী নতুন এসেছে বাড়িতে। টেপীর শরীরে বোধ হয় বিলিতী কুকুরের রক্ত আছে। টেপীর কাছে ভেলুকে আশি বছরের বুড়ো দেখায়।

টেপীর দাপাদাপির অন্ত নেই। চোখের পলকে ভেলুর খাবার খেয়ে যায়। ভেলু তখন নিঃশব্দে শরৎচন্দ্রের ইজিচেয়ারের নীচে বসে।

টেপী বেশি ছুটোছুটি করলে শরৎচন্দ্র চাকরকে ডেকে বলতেন—ভোলা, ভোলা, টেপীটাকে বাঁধ, ও আমাকে আর ভেলিকে সমানে জ্বালাতন করছে।

বহুদূর থেকে দুজন ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন। ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়ির ভেতর থেকে শরৎচন্দ্র এলেন। গম্ভীরমুখে বসলেন ইজিচেয়ারে। দূরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি মহা ভাবনায় ডুবে আছেন। শুকনো গলায় বললেন, "কাল সারা-রাত ঘুমোয়নি।" দুজন ভদ্রলোক চুপ।

আবার শরৎচন্দ্র বললেন, "বোধহয় মশার জন্যে ঘুমোতে পারছে না মনে করে মাঝরাতে উঠে মশারি ফেলে দিলাম...কিন্তু মশারির ভেতর শুয়ে আরও ছটফট করতে লাগল।"

"কারুর বুঝি অসুখ করেছে?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "অসুখ...হাঁ...মানে...পেট গরম হয়েছিল... ঘি-টা বোধহয় ভাল ছিল না।"

ভেলুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। 'ভদ্রলোক-দের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, "ভেলির জন্যে যে কী দুর্ভাবনায় পড়ি মাঝে মাঝে...।"

শেষ পর্যন্ত ভেলু এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তাকে বেল-গেছে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে হল। শরৎচন্দ্র নিজে গিয়ে ভেলুকে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন। এই সময়ে কিংবা তার আগে একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

হাসপাতালে ঢুকতে ঢুকতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কে আছে শরৎদা?"

মুখ ভার করে শরৎচন্দ্র কাতরকণ্ঠে বললেন, "কী যে হয়েছে ভেলির, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না...খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিল...বাধ্য হয়েই হাসপাতালে দিয়েছি...এ-কদিন

রাত্তিরে এতটুকুও ঘুমুতে পারিনি।"

ভেলুর ওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। উঠোন থেকে কয়েকটা ধাপ, তার উপর বারান্দার ধারে ভেলুর ওয়ার্ড।

হঠাৎ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কানের কাছে মুখ এনে শরৎচন্দ্র বললেন, "আস্তে এসো, যেন পায়ের শব্দ না হয়।"

শরৎচন্দ্র জুতো খুলে পা টিপে-টিপে ধাপগুলোর উপর দিয়ে বারান্দায় উঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সংকেত করলেন, "কথা বোলো না!" চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ।

কিছুক্ষণ চুপ করে সেই ঘরের দিকে চেয়ে থেকে শরৎচন্দ্র পা টিপে-টিপে অতি সন্তর্পণে ফিরে এলেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কানের কাছে মুখ এনে চুপি-চুপি বললেন, "ঘুমুচ্ছে, আহা! হয়তো দুদিনের পর আজ একটু ঘুমুচ্ছে! আমার একটু সাড়া পেলেই উঠে পড়ত! শব্দ কোরো না...আস্তে-আস্তে চলো...।"

আস্তে-আস্তে পা টিপে-টিপে শরৎচন্দ্র ফিরে চললেন। এক পা করে এগিয়ে চলেন আর ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চেয়ে দেখেন।

পা টিপে-টিপে গেট পর্যন্ত এলেন। গেটের বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, "আর ভয় নেই, এবার কথা বলতে পারো। ওখানে একটু কথা বললে আর নিস্তার ছিল! ও নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে উঠে বসত!"

১৯২৫ সালের ২৩ এপ্রিল সকাল ছটায় ভেলু মারা গেল। সকাল সাড়ে ৯টায় বাজেশিবপুরে ভেলুর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হল। বাগানে।

বিকেলের দিকে শৈলেশ বিশী এলেন। শরৎচন্দ্রকে বললেন, "দাদা, স্নানাহার—"

শরৎচন্দ্র বললেন, "ওসব কিছুই হয়নি।"

"দাদা, তাহলে তার শেষের কাজ?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "তা হয়েছে, আমি নিজের হাতে বাগানে তাকে কবর দিয়েছি। এখন তোমরা বলো তো, ওর একটা স্মারক স্তম্ভ কেমন হলে ভালো হয়?"

"দাদা, রেসের ঘোড়া মরলে, সেই ঘোড়ার মতন স্ট্যাচু তার কবরের উপর গড়ে দেয়। এও তাই হবে। ভেলুর একটা মার্বেল স্ট্যাচু গড়ে দিন।"

শৈলেশের চোখে পড়ল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বউদি চোখ মুছছেন। শরৎচন্দ্র বললেন, "ওরা বলছে, শ্বেতপাথরের পাদ-পীঠের উপর একটা মার্বেলের তুলসীমঞ্চ থাকবে।"

কারও খাওয়া হয়নি, বিকেল গড়িয়ে গেছে, বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। শৈলেশ অতএব শরৎচন্দ্রকে বললেন, "দাদা, একবার ভেলুর কবরটা দেখতে চাই।"

শরৎচন্দ্র চাকরকে ডাকলেন। শৈলেশকে বাগানে নিয়ে যেতে বললেন। বাগানে গিয়ে ভেলুর কবর দেখে ফিরে এলেন শৈলেশ। শরৎচন্দ্র বললেন—নিজ হাতে কোদাল দিয়ে এক কোমর মাটি খুঁড়ে ওকে কবর দিয়েছি। আমার গা ব্যথা হয়ে গেছে।

মণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন ঃ "সেদিন কিসের একটা ছুটি ছিল। আমি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম, তিনি মেঝেতে শুয়ে আছেন, অত্যন্ত বিষণ্ণ। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'ভেলো আজ তিন দিন মারা গেছে।' প্রিয়তমের বিয়োগেও বোধ করি এত কাতর হতে দেখা যায় না, যা তাঁকে সেদিন দেখলাম। বললেন, 'মণি, আমি যে একে হারিয়ে কত ব্যথা পেয়েছি, তা কেউই বুঝতে পারবে না—ভেলো যে আমার কত প্রিয় ছিল তাও কেউ জানে না।...'"

ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র আরও কয়েকটি কুকুর পুষেছেন। কিন্তু ভেলুর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

কিছুকাল হাওড়া পশুক্লেশনিবারণী সমিতির চেয়ারম্যান থেকেছেন শরৎচন্দ্র। পশুপাখির উপর শরৎচন্দ্রের চিরদিনই প্রাণের টান।

রেঙ্গুনেও শরৎচন্দ্র পাখি পুষেছেন। রেঙ্গুনের রাস্তায় দেখা গেছে শরৎচন্দ্র বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাঁর কাঁধে বসে আছে সোনার চেনে বাঁধা নুরীপাখি।

রেঙ্গুনে সতীশচন্দ্র দাস একদিন সন্ধ্যার পর শরৎচন্দ্রের ঘরে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি পাখিকে খাওয়াচ্ছেন।

সতীশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "রাত্রে আবার পাখিকে খেতে দিতে হয়?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "এরা যখন জঙ্গলে থাকে তখন ইচ্ছামত খাবার যোগাড় করে। কিন্তু যখন লোকালয়ে আবদ্ধ থাকে, ঠিক আমাদের মত করে নিতে হয়। যখন ভালোবেসে পাখিকে জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে, সে ভালোবাসাটা কি দেখবার জন্য? পাখি যখন তোমার আচার-ব্যবহার শিখতে থাকে, তখন তুমিও পাখিকে নিজের করে নিয়ে ভাল না-বাসলে তাদের প্রাণে লাগে। যতক্ষণ বনের পশুপাখিকে নিজের করে নিতে না-পারবে, ততক্ষণ এদের আটকে রাখবে কেন?"

বাড়িতে একটি ছাগলের দুটি বাচ্চা হয়েছে—দুটিই পাঁঠা। ওরা বড় হয়ে উঠল। অনেকেরই পাঁঠার উপর লোভ পড়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ওদের সযত্নে পালন করেছেন।

মাছ ও বেজী নিয়েও বলবার মতো খবর আছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন ঃ "পানিত্রাসের বাগানে পুকুরের মাছরাও তাঁকে চিনত। দুটি মাছ আবার তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। একবার বর্ষায় রূপনারায়ণ ছাপিয়ে বাগানে জল ঢুকে সেই মাছ-দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর দুঃখ কত। তাঁর বাগানের একটি গর্তে দুটি বেজী তাদের বাচ্চা নিয়ে বাস করত। গাঁয়ের এক ছেলে সেই বাচ্চাটিকে চুরি করে পালায়। শুনেই শরৎচন্দ্র তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। ছেলেটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সন্তানের অভাবে মা - বাপের মনে কত কষ্ট হয়। কিন্তু ছেলেটি তবু বুঝল না দেখে শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তখন জোর করে বাচ্চাটিকে কেড়ে এনে আবার নেউল-দম্পতিকে ফিরিয়ে দিলেন।"

একটি রুগ্ন গরুর আর্তনাদ শরৎচন্দ্রের কানে গেল। তাঁর বাড়ির কাছে একটা খোলা জায়গায় একজন গোয়ালা পা ভাঙা রুগ্ন গরুকে ফেলে সরে পড়েছে। শরৎচন্দ্র খুঁজে বের করলেন সেই গোয়ালাকে ; কিন্তু সে কিছুতেই গরুটিকে ঘরে নিয়ে যেতে রাজি হল না। শরৎচন্দ্র তখন অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিজের খরচে গরুটিকে হাসপাতালে পাঠালেন।

সাপের উপর শরৎচন্দ্রের চিরদিনের ভালবাসা। সামতাবেড়ের বাড়িতে শীতের দুপুরে সামনের বাগানের ঘাসে বড়-বড় সাপ রোদ পোয়াতে আসে। শরৎচন্দ্র পাহারা দিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের বারণ করেছেন, "ওরে তোরা ওদিকে যাসনে। আহা! আহা! ওরা একটু রোদ পোয়াচ্ছে, তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।"

দিনকয়েকের জন্য দেওঘরে গিয়েও শরৎচন্দ্র পাখি পুষেছেন। তিলোত্তমা দেবী ও কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "যখন তিনি দেওঘরে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অতিথি ছিলেন, তখন বহু পক্ষী সংগ্রহ করে পুষেছিলেন। সে সময়ে প্রায়ই তিনি বলতেন, চলে যাবার সময় তাদের সব উড়িয়ে দিয়ে যাবেন। তাঁর মত মমতা দিয়ে পক্ষীগুলির যত্ন যে আর কেউ করবে, এ-কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না।"

মৃত্যুর দিনকয়েক আগে শরৎচন্দ্র একটি ময়ূর কিনেছেন। শেষ শয্যায় শুয়েও পার্ক নার্সিংহোমে শরৎচন্দ্র নিজের ঘরে দুটি ক্যানারি পাখি আনিয়ে রেখেছেন। দুটি পাখি সারাদিন গান করেছে। শরৎচন্দ্র শান্ত হয়ে শুনেছেন।

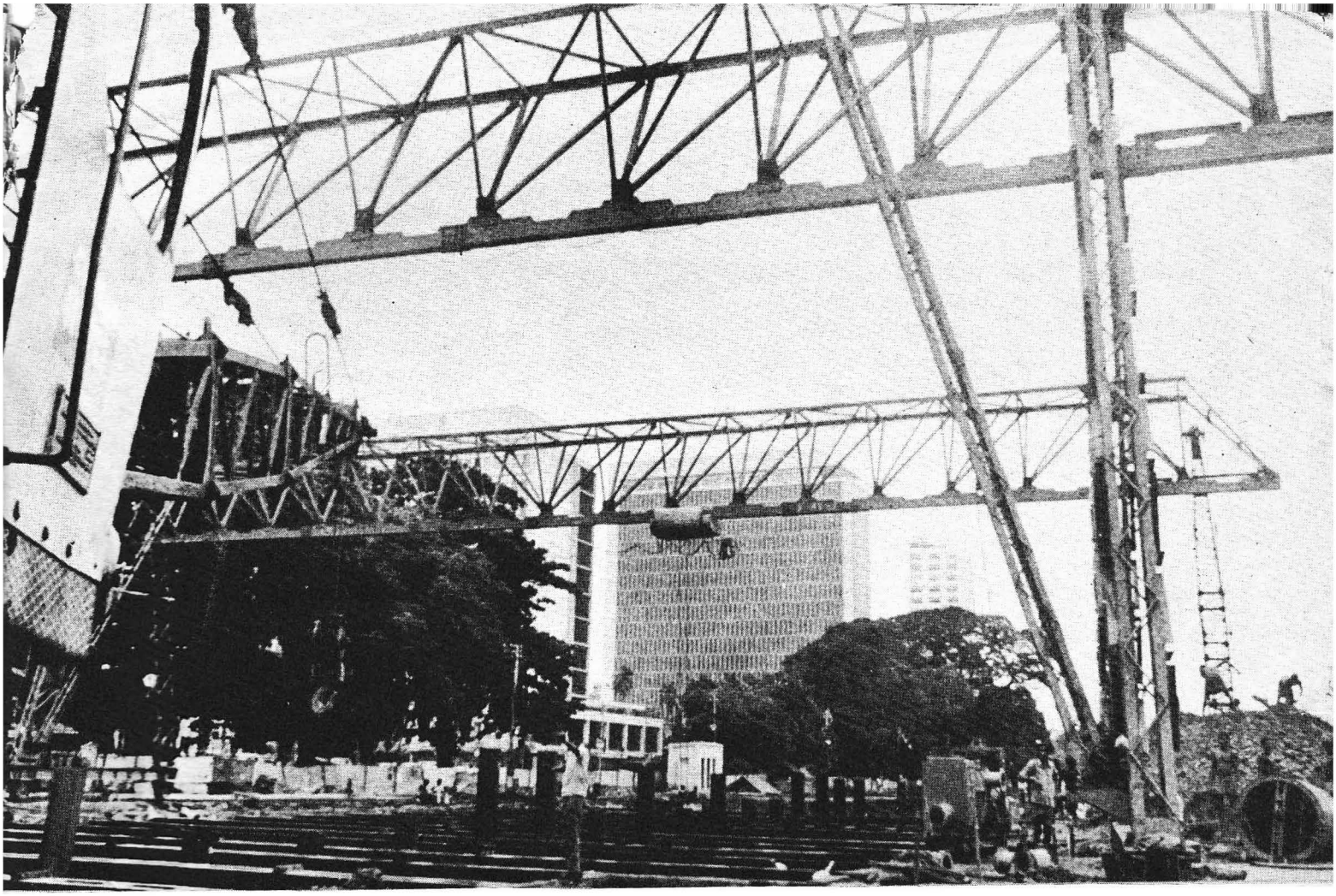

আমাদের কলকাতা

রত্নাকর

প্রিয় মেজদি,

গত বুধবার মীনুর জন্মদিন ছিল, আমরা সবাই মিলে পার্ক স্ট্রিটের একটা চীনা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। খুব খেলাম, খেয়ে দেয়ে ঠিক হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতে যাব। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে দেখি, একটা বিরাট পুকুরের মধ্যে নেমে কত লোক কাজ করছে। অত বড় পুকুর, কিন্তু পুকুরে একটুও জল নেই, সব জল তুলে ফেলা হয়েছে। বাবা বলল, ওখানে ভূগর্ভ রেলের কাজ চলছে। ভূগর্ভ রেলের কথা কত শুনেছি, কিন্তু দেখলাম এই প্রথম। সত্যি, ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়, মাটির নীচে দিয়ে ট্রেনে চড়ে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চলে যাব, অথচ মাটির ওপরে রাস্তা-ঘাট, মাঠ যা যেমন আছে ঠিক তেমন থাকবে। পার্ক স্ট্রিটের মোড় থেকে বিড়লা তারামণ্ডলের কাছাকাছি পর্যন্ত কাজ চলছে। আমরা হেঁটে-হেঁটে সব দেখলাম। একটা বড় রাস্তার মাঝে মাটি খুঁড়ে ফেলা হয়েছে অনেকখানি। মাটির নীচে কংক্রিটের গাঁথনি হচ্ছে, বিশাল বিশাল লোহার বিম বসেছে অনেকগুলো। একটা ক্রেন দেখলাম প্রকাণ্ড লোহার ড্রামে করে মাটি তুলে আনছে। এত মাটি তুলেছে যে, এক দিকটা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেছে। ক্রেনে করে মাটি তোলা দেখতে খুব মজা লাগছিল। আমরা দেখছিলাম আর বাবা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ভূগর্ভ রেল তৈরি হবে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত। খরচ হবে প্রায় ২৬০ কোটি টাকা। আচ্ছা মেজদি, ২৬০ কোটি টাকা কি অনেক টাকা? দমদমেও অনেকখানি কাজ হয়ে গেছে। ট্রেন দমদম থেকে মাটির ওপর দিয়ে এসে বেলগাছিয়ার কাছে মাটির নীচে ঢুকে যাবে। বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত এক কিলোমিটার টানেল তৈরি হবে। বেলগাছিয়া থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পুরো রেলপথটাই থাকবে মাটির নীচে। বাবা বলল, মাটির নীচে দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলে আমাদের আর যাতায়াতের একটুও কষ্ট হবে না। এখন বাসে-ট্রামে কী যাচ্ছেতাই ভিড়, অনেক সময় ওঠাই যায় না। ভূগর্ভ রেল হয়ে গেলে এ-সব কষ্ট আর একটুও থাকবে না, তাছাড়া সময়ও অনেক অল্প লাগবে। তখন দমদমের মেজ পিসীর বাড়ি থেকে ট্রেনে উঠলে টালিগঞ্জের ছোট কাকুর বাড়ি দেখতে-দেখতে এসে যাবে। ট্রেন তো, সাঁ সাঁ করে ছুটবে। কী মজা হবে, তাই না! মীনু সব দেখেশুনে গম্ভীরভাবে বলল, আমি কিন্তু মাটির নীচে ট্রেনে চড়ব না। আমি বললাম, সে কী রে! কেন? মীনু তখন বলল, আহা, জানো না বুঝি, মাটির নীচে গেলে দম বন্ধ হয়ে যাবে যে। ওর কথা শুনে সবার সে কী হাসি! হাসতে-হাসতে আমাদেরই দম বন্ধ হয়ে আসছিল। জল তেষ্টাও পেয়ে গেল ভীষণ। তখন আমরা সবাই মিলে আইসক্রিম খেলাম। তুমি আর জামাইবাবু আমার প্রণাম নিও, বুবুনকে দিও অনেক-অনেক ভালবাসা।

তোমার শমী ৪৭

টেব্‌ল টেনিসের পাঠশালা

স্ট্রাইকার

ইয়ানিয়ার, স্টিপানসিচ, পার্ক ইয়াং সুন, চ্যাং লী সুরবেক, অবলোস্কি—এই সব বিদেশী নামগুলো বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতা ও আশপাশের খেলোয়াড় মহলে খুব শোনা যাচ্ছিল। এখন আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। ওই নামের মুখগুলো ক্রমশই কেমন যেন আবছা হয়ে আসছে। ভাবতে অবাক লাগে, এই কলকাতাতেই দেড় বছর আগে ওয়ার্ল্ড টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় ওই বিরাট নামগুলো খেলার রসিকদের বেশ নাড়া দিয়েছিল। রসিকদের দলে এমনিতে বড়রা একটু ব্যস্তবাগীশ, দিনরাত নানা ব্যাপারে থাকতে-থাকতে তারা হয়তো চট করে বেমালুম অনেক কিছুই ভুলে যায়। কিন্তু ছোটদের ধাত আলাদা, তারা বিরাট-কিছু হতে দেখলেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, ওরা যদি পারে তো আমরা পারব না কেন?

সত্যিই ওই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ছোটদের মনে পুরু ছাপ ফেলেছে। হয়ত অনেকেই জিদে টইটম্বুর। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় না, কিন্তু উত্তরপাড়ার গৌতম সরকার, মেদিনীপুরের গৌতম ভকত, কাঁচড়াপাড়ার ধ্রুবজ্যোতি দে, পাইকপাড়ার সুনীত মুখার্জী ও বর্ধমানের মহম্মদ ইলিয়াসের এই জেদাজেদির প্রশ্নটা একটু অন্যরকম। তারা চেষ্টা করে দেখছে, সত্যিই ওই বড়-বড় প্লেয়ারদের কাছাকাছি যাওয়া যায় কিনা! ধাপে ধাপে তারা এগোবে। সেদিক থেকে তাদের শুরুর বয়সটা বেশ মানানসই, গড়ে ১৪।১৫ বছর। ওদের এই সুযোগ দিয়েছেন বেংগল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। এদের একমাত্র লক্ষ্য—শুরুতেই ভুল খেলা শিখে বাংলার ভবিষ্যৎ টেবল টেনিস প্লেয়ারদের বনেদ যেন নড়বড়ে না হয়ে যায়।

মাসখানেক আগের ঘটনা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে "ইয়ানিয়ার" অথবা "পার্ক ইয়াং সুন" হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ৮০ জন ছেলেমেয়ে বি টি টি এ (বেংগল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন) দফতরে দরখাস্ত পাঠায়। মস্ত সুযোগ, মাসিক কুড়ি টাকা মাইনেতে ছ মাস ধরে টেবল টেনিস পাঠশালায় খেলায় রপ্ত হওয়া, এরকম বন্দোবস্ত পশ্চিমবংগ ছাড়া ভারতের আর কোথাও নেই। সামান্য টাকার বিনিময়ে বিদেশী নিটাকু ব্যাট পেয়েছে প্রত্যেক শিক্ষার্থী। বল যোগাচ্ছেন অ্যাসোসিয়েশন। সপ্তাহে তিনদিন রোজ দু ঘণ্টা করে রবীন্দ্র সরোবরের ইনডোর স্টেডিয়ামে ক্রমাগত যেন তাঁদের মাকুর মতো আওয়াজ চলেছে—খটাস, খটাস, টকাস, টকাস, স্টিগা বোর্ডের ওপর বাংলার ভবিষ্যৎ টেবল টেনিস প্লেয়াররা কসরত করছে।

বছর দুয়েক আগেও ঠিক এরকম ব্যাটে-বলে-বোর্ডে শেখার সুযোগ আদৌ কেউ ভাবতে পারত না। তখন ছিল শুধু পাড়ার ক্লাবে অথবা কলেজ কমনরুমে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেলুলয়েডের বল পিটিয়ে ঘাম ঝরানোর সুযোগ। ওরই মধ্যে একটু ভাল খেলতে পারলে কম্পিটিশনে নাম দেওয়া যেত। কিন্তু প্রতিযোগিতায় কী ভুলে হার হল, তা দেখিয়ে দেওয়ার মতো অভিভাবক ছিল না। আসলে টেবল টেনিস খেলার ব্যাকরণ না জেনেই বেশিরভাগ প্লেয়ার খেলা ধরেছে ও ছেড়েছে। এইসব গোলমেলে শিক্ষা নিয়ে ছিটকে গিয়ে দু-একজন সত্যিকারের ভাল খেলোয়াড় তৈরি হয়। কিন্তু তাদেরও যা-কিছু বড়দরের অনুশীলনের সুবিধা চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ-র ভ্যাপসা-গরমে ঠাসা একতলার ঘরে সীমা-

বন্ধ ছিল। সেখানে বোর্ডের সংখ্যা মাত্র দুটি। বাছাই প্লেয়ারদের ভিড়। কে খেলবে, কে খেলবে না—এই তর্কেই অনুশীলনের বিরাট সময় খরচ হয়ে যেত। এজন্যে আজও বাংলার অনেক নামী প্লেয়ার আফশোস করে বলেন, গোড়াতেই এত গলদ থাকায় ও অনুশীলনের অভাবে আমরা সত্যিকারের বড় প্লেয়ার হতে পারলাম না।

ওইরকম কষ্টে সৃষ্টে বড়-হওয়া বাংলার বিখ্যাত প্রাক্তন প্লেয়ার বিশ্বনাথ লাহিড়ী, জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি, সরোজ ঘোষ, দীপককুমার ঘোষ, শ্যামসুন্দর বসু ও সমীর মুখার্জির হাতেই টেবল টেনিস স্কুলের শেখানোর ভার পড়েছে। এদের মধ্যে কোচ সরোজ ঘোষ সখেদে জানালেন, আমার খেলার গোড়া তো দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। ফলে, প্রচুর ভুলটুল শেখা হয়ে গেল। অবশ্য ভুল গ্রিপে ব্যাট ধরে গেলেও বেঙ্গল টিমে চানস পেয়েছিলাম। সেটা ছিল বছর বাইশ আগের কথা। ভিক্টর বার্না কলকাতায় কোচ করতে এসে আমার ব্যাট ধরা থেকে থ হয়েছিলেন। বার্না বললেন, "এখন আর তোমার গ্রিপ পাল্টাব না। এখন বদলালে তোমার নিজের খেলাই ভুলে যাবে।" সরোজবাবুর মনে এজন্য চিরদিনই একটা খচখচানি রয়ে গেছে, শুদ্ধভাবে টেবল টেনিস খেলাটা আর এ-জন্মে হয়ে উঠল না।

ঠিক এইরকম মনের ব্যথায় বি টি টি-এর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কোনদিন ভুগবে না। ওরা সপ্তাহে তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা ফুটওয়ার্ক, গ্রিপ, স্টান্স, পুশ ও সার্ভিস নির্ভুলভাবে রপ্ত করার পাঠ নিচ্ছে। বোর্ডের সামনে প্রথম দিকে দাঁড়িয়ে অনেকেরই ঠিক সময় বল পড়ত না অথচ ব্যাটের স্ট্রোক হয়ে যেত। এমন কী ব্যাটে-বলে হলেও নেট পার করে বল অপরের বোর্ডে পাঠানোও ছিল দুরূহ সমস্যা। নিছক ম্যাজিকই বলতে হয়, মাত্র মাস দুয়েকের প্র্যাকটিসে এখন প্রতিটি শিক্ষার্থীই টেবল টেনিস বোর্ডের সঙ্গে বলে-ব্যাটে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। এখনি ওদের মধ্যে বেশ চনচনে খিদে পেয়েছে. প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস আরও প্র্যাকটিস চাই। অবশ্যই এই খিদের মেজাজটা আলাদা। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোর্ডের উপর বল পেটালেই বুঝি মস্ত প্লেয়ার হওয়া যায়। এই ধারণা নিয়ে এখানকার কচি শিক্ষার্থীরাও খেলা শুরু করেছিল। কিন্তু বোর্ডে প্র্যাকটিসের আগে স্টেডিয়ামের মাঠে আধঘণ্টাখানেক পি টি করার উপকারিতা এখন ওরা ক্রমশ টের পাচ্ছে। আধঘণ্টার পরিশ্রম যতই বাড়ুক-না কেন ওদের ক্ষতি নেই। টেবল-টেনিসের খেলার নানাবিধ কৌশলের অন্ধি-সন্ধি এখন শিক্ষার্থিনী মুকুতা মুখার্জির কাছে ধরা দিচ্ছে। গত ওয়ার্ল্ড চ্যামপিয়নশিপের সময় সে স্ম্যাস, টপ-স্পিন ও চপ্-মারকে মনে মনে মুখস্থ করত, এখন সে সেগুলো নিজের ব্যাটের মধ্যে বেঁধে নিচ্ছে। অরিজিৎ মিত্রের ধারণা ছিল—টেবল-টেনিস খেলাটা নেহাতই মেয়েদের খেলা, ওতে পুরুষালী ব্যাপার কিছু নেই, কিন্তু মাত্র দু-মাসেই তার ধারণা পাল্টেছে। অতটুকু সেলুলয়েডের বলটাকে বোর্ডের উপর বশ মানানো তার কাছে রীতিমত বীরত্বের বিষয়।

অরিজিৎ অথবা মুকুতা ছ মাসের শিক্ষার শেষে কোথায় যাবে? না, তা নিয়েও কোনও দুর্ভাবনা নেই। বি টি টি-এ সে চিন্তায় সজাগ রয়েছেন। যদি কারও মধ্যে বিশেষ বাড়তি কিছু চোখে পড়ে, তবে তাদেরও অনুশীলনের ব্যবস্থা হবে। এইভাবেই বছর-বছর টেবল টেনিস বোর্ডে নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। তখন ভারতীয় টেবল টেনিস দলে বাংলার ছেলেমেয়েরাই হবে সেরা।

ভারতের দুই দৌড়বাজ

পুষ্পেন সরকার

১৯২০ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল। দীর্ঘ ৫৬ বছর। ১৩টি অলিম্পিক হয়ে গেছে এই সময়ের মধ্যে। ভারতীয় অ্যাথলীটরা প্রতিটি অলিম্পিকে যোগ দিয়েছে, আর শূন্য হাতে ফিরে এসেছে বারে বারে।

অ্যাথলেটিকসে ভারত কয়েকবার অলিম্পিক পদকের কাছাকাছি গিয়েও তা ছুঁতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকসের হপ স্টেপ অ্যান্ড জাম্পে হেনরি রেবেলো এবং হাইজাম্পে গুরুনাম সিং, ১৯৬০ সালে রোমে ৪০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং, ১৯৬৪ সালে টোকিওতে ১০০ মিটার হার্ডলসে গুরুবচন সিং রনধাওয়া এবং ১৯৭৬ সালে মনট্রিলে ৮০০ মিটার দৌড়ে শ্রীরাম সিং ফাইনালে পেঁছন। রেবেলোর পদক লাভের আশা অনেকটা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু শেষ লাফের আগে তাঁর পায়ের পেশীতে টান ধরায় সে আশা নষ্ট হয়। মিলখা এবং শ্রীরাম আপ্রাণ চেষ্টা করে জয়ের কাছাকাছি এসেও ভারতকে অ্যাথলেটিকসের পদক এনে দিতে পারেননি।

মিলখা তাঁর ব্যর্থতার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ দায়ী করে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, মুহূর্তের ভুলে আমার এতদিনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। অ্যাথলেটিকসে ভারতের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে

শ্রীরাম সিং। মণ্ট্রিলে ফাইনালে উঠেছিলেন

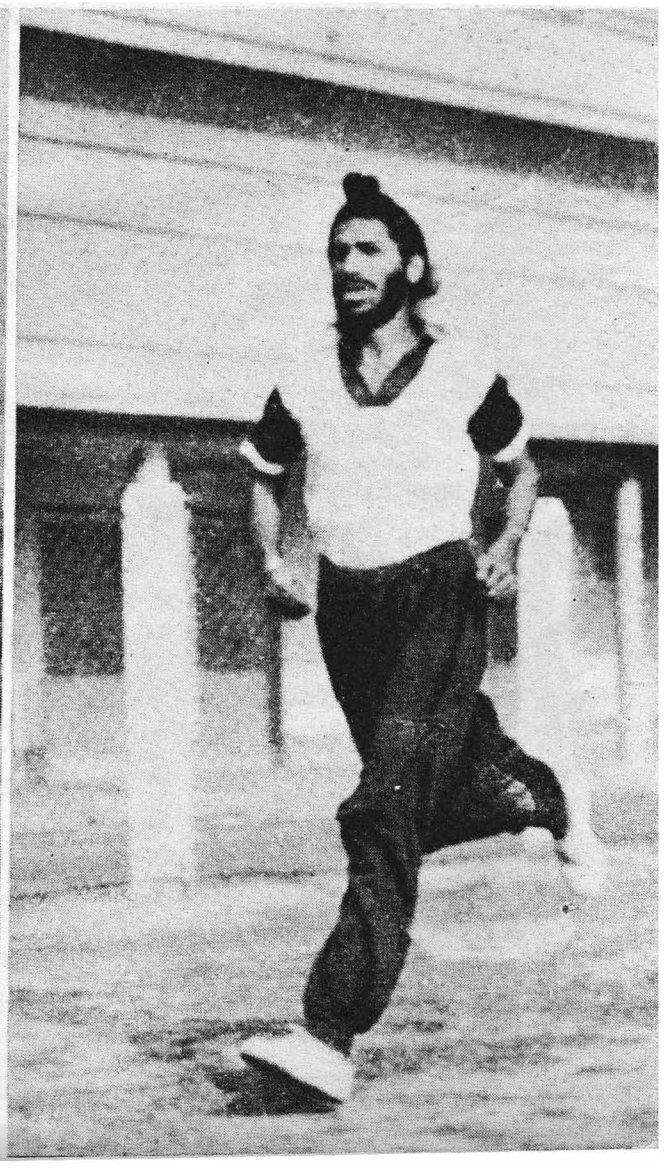

মিলখা। প্র্যাকটিসে ভাটা পড়েনি...

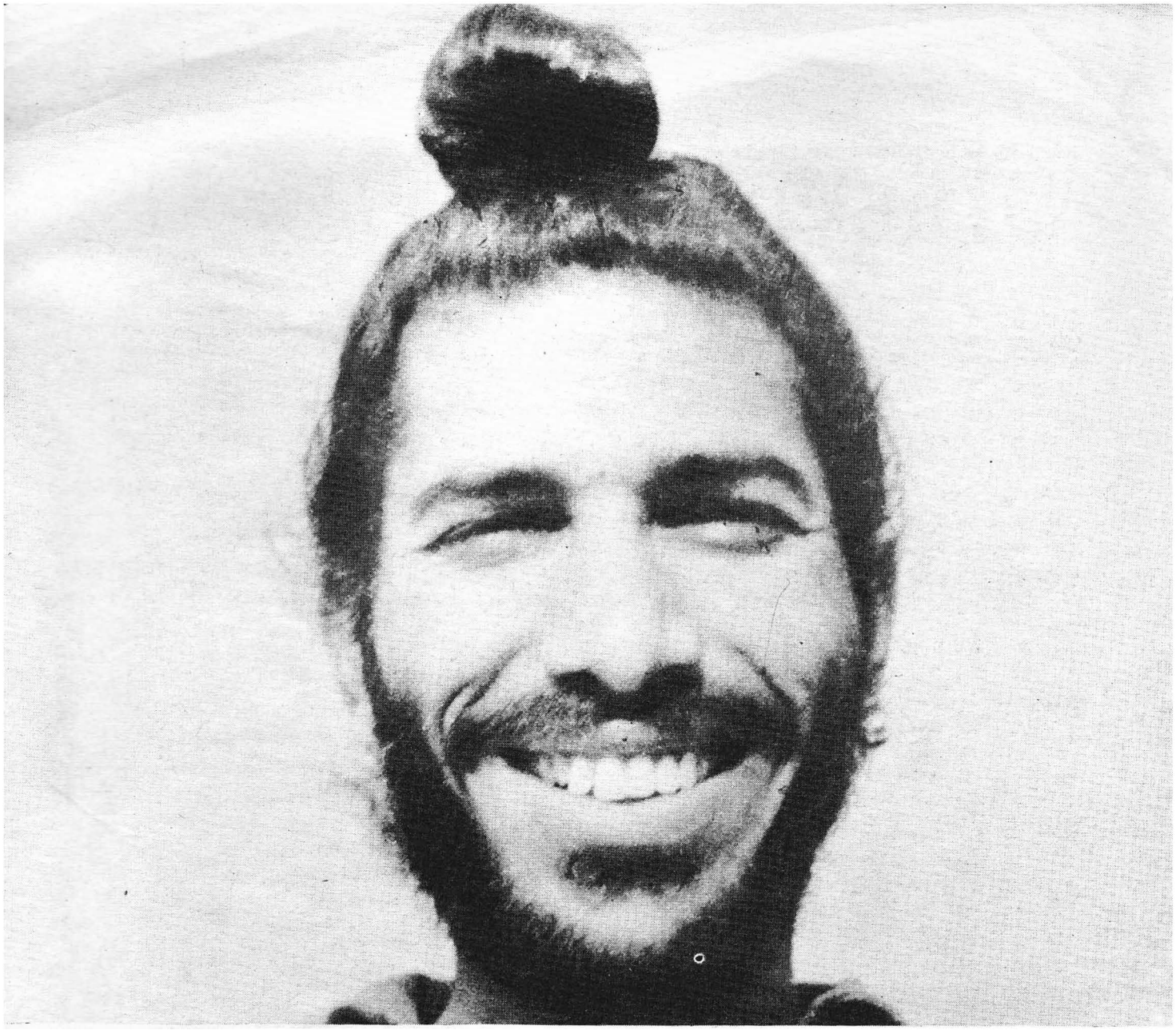

মিলখা সিং। অল্পের জন্য...

দেবার প্রতিজ্ঞা আমি নিজের ভুলেই পালন করতে পারিনি।

রোম অলিম্পিকসে ৪০০ মিটার দৌড় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। অলিম্পিকসের আগে ইংল্যান্ড-ফ্রান্স দ্বৈত অ্যাথলেটিকসে আফ্রিকার আব্দুল হাই ৪৫·৯ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড় শেষ করে মিলখাকে খুব চিন্তিত করেন। কারণ তখন পর্যন্ত মিলখা এই দূরত্ব ৪৬ সেকেন্ডের কমে অতিক্রম করতে পারেননি। এরপর ফ্রান্সে এক আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতায় তিনি ৪৫·৮ সেকেন্ড সময় করে ঐ আব্দুল হাইকে হারান। এই সময়ে অলিম্পিক রেকর্ড ছিল ৪৫·৯ সেকেন্ড। ফলে মিলখার পদক লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিত মনে হয় সকলের কাছে।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা তো সব সময় হয় না। অলিম্পিকসের প্রতিটি রাউন্ডে ভাল সময় করে তিনি ফাইনালে পৌঁছান। ফাইনালের দিন সকালে ভারতের একজন কর্মকর্তা তাঁর মনের চাপ হাল্কা করার জন্য রোম শহরের সৌন্দর্য দেখাতে নিয়ে যান। মিলখার শরীর ও মন তাজা ফুলের মত ঝরঝরে হয়ে ওঠে। স্টেডিয়ামে ঢুকতেই চারদিক থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। উপস্থিত ভারতীয়রা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

দৌড় শুরু করার আগে মিলখা ঈশ্বরকে স্মরণ করে প্রার্থনা জানান, বিশাল ভারতকে এতদিনের লজ্জা ও গ্লানি থেকে মুক্ত করার শক্তি দাও প্রভু। দৌড় শুরু করার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান। স্টার্টারের পিস্তল গর্জে ওঠে। দুশো মিটার পর্যন্ত উড়ন্ত শিখ সকলের আগে-আগে চলেন। আড়াইশো মিটারেও মিলখার সামনে কেউ নেই। সারা স্টেডিয়ামে মিলখার জয়-জয়কার। ভারতীয়রা আনন্দে পাগলের মত লাফাচ্ছে। হঠাৎ মিলখা ভাবেন, এবার একটু হাল্কা ভাবে দৌড়োই। শেষ একশো মিটার আবার দেহের সবটুকু শক্তি উজাড় করে শেষ সীমানায় পৌঁছব। সেই নিমেষের ভুল তাঁর জীবনের সব থেকে দুঃখজনক ঘটনা হয়ে আছে। তিনশো মিটারের মাথায় আমেরিকার ওটি ডেভিস (প্রথম) জার্মানির কার্ল কাউফম্যান (দ্বিতীয়) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মল স্পেন্স (তৃতীয়) তাঁকে পিছনে ফেলেন। মিলখা আর ওঁদের ধরতে

পারেন না। মিলখা হন চতুর্থ। ভারতের নিশ্চিত পদক লাভের আশা হাতছাড়া হয়ে যায়। সেদিনের ওই দৌড়ে প্রথম দুজনের সময় নতুন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে। এমন কী চতুর্থ মিলখাও ভেঙে দেন আগের অলিম্পিক রেকর্ড।

এবারের মনট্রিল অলিম্পিকসে ভারতের ব্যর্থতার মধ্যে শ্রীরাম সিং কিছুটা সান্ত্বনা। রাজপুতনা রাইফেলসের এই সৈনিক নিঃসন্দেহে ভারতীয় অ্যাথলীটদের সম্মান উঁচু করেছেন। আটশো মিটার দৌড়ে তিনি কোন পদক পাননি ঠিকই, (সাফল্যের তালিকায় ছয়জনের পর তাঁর নাম), তবুও ভারত এবং এশিয়ার সর্বপ্রথম দৌড়বাজ হিসাবে ১ মিঃ ৪৫·৭৭ সেকেণ্ড সময় তাঁর আন্তরিক চেষ্টার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শোনা গেছে আটশো মিটারের স্বর্ণপদক-বিজয়ীর চিন্তা ছিল শ্রীরামকে নিয়ে। চারশো ও আটশো মিটার দৌড়ে বিজয়ী এবং অলিম্পিকসে নতুন ইতিহাস রচয়িতা কিউবার আলবার্টো যুয়ানতোরিনো সে আশংকার কথা আগেই বন্ধুবান্ধবকে জানিয়েছিলেন। এই দৌড়ে বত্রিশ জন ছিল। আট জনের দল করে প্রথম রাউণ্ডে চারটি হিট হয়। প্রতিটি হিটের প্রথম তিনজন এবং অন্যদের মধ্যে যারা কম সময়ে দৌড় শেষ করেছে এমন চারজনকে নিয়ে মোট ১৬ জনকে সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়। শ্রীরাম প্রথম রাউণ্ডে সময় দেন ১ মিঃ ৪৫·৮৬ সেকেণ্ড, এবং হিটে দ্বিতীয় হয়ে সেমিফাইনালে দৌড়োবার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

সেমিফাইনালে থাকে আট জনের দুটি দল। প্রতিটি দলের প্রথম চার জন ফাইনালে ওঠে। শ্রীরাম প্রথম দলে ১ মিঃ ৪৬·৪২ সেকেণ্ডে দৌড় শেষ করে চতুর্থ হন।

ফাইনালে আট জন প্রতিযোগী। বিশ্বের বাছাই আট জন বলা যায়। সকলেই দক্ষ, কুশলী। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও সাধনায় গড়া তাঁদের দেহ। ষষ্ঠ লেনে শ্রীরামের স্থান। দৌড়ের আগে তিনি ঠিক করেছিলেন দৌড়ের শুরুতেই সব শক্তি উজাড় করে দেবেন না, শেষে সমস্ত শক্তি কাজে লাগাবেন। দুশো মিটার দৌড়ে শ্রীরাম দেখতে পান তাঁর আগে আগে চলছেন তিনজন। পাঁচশো মিটারে চারজন তাঁকে পিছনে ফেলেন। দৌড়ের শেষ ফিতে ছোঁবার আগে আরও দুজন তাঁকে অতিক্রম করে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওই ছয়জনকে শ্রীরাম আর ধরতে পারেন না। ষাট কোটি মানুষের দেশ ভারত অলিমপিকসের অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় আজও কোনো পদক পেল না। কবে সে আশা পূর্ণ হবে?

বজ্রসেন

দুই ক্লাব দুই জার্সি

ক্লাবকে পাওয়া যায় কোথায়? টেণ্টে? না, ক্লাবের অফিসে? না। প্লেয়ারের জার্সিতে। জার্সিটাই তো ক্লাব। তাই নয় কি? সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত কবিতাকে একটু পালটে নিয়ে বলা যায়—রঙের আমি রঙের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা! অমুক রঙের জামা গায়ে দিয়ে যারাই খেলুক না কেন তারাই জিতুক, এই রকমটাই চায় সবাই। হাবিব-আকবরের কথাটাই ধরা যাক। গত বছরের আগের বছর হাবিব বা আকবর গোল করল যারা চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়েছে, তারাই এবার বলেছে মনে মনে, "ওদের সব শট আর হেড যেন মারের ওপর দিয়ে কি পোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।" কেন? না ওরা যে জামা বদলে ফেলেছে। প্রিয় ক্লাবটির জার্সি ছেড়ে যখনই প্লেয়ার অন্য জার্সি ধরেছে, বাস! আর তোমার সঙ্গে কোনও খাতির নেই। তা তুমি যত বড় খেলোয়াড়ই হও না কেন। খেলোয়াড় হিসেবে অবশ্য তোমাকে চুপিচুপি ভালবাসব, কিন্তু প্রাণ থাকতে চাইব না তুমি অন্য জার্সি পরে ভাল খেলা দেখাও।

এমনই হল জার্সির মহিমা। আর, সেই জার্সি যদি মোহনবাগান কি ইস্টবেংগলের হয়, তবে তো কথাই নেই। কত বছর আগে এই দুটি জনপ্রিয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতারা জার্সির রঙ পছন্দ করে গেছেন, আর আজ সেই রঙের লড়াইয়ে গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল! মেরুন-সবুজ আর লাল-হলুদ জার্সি কারা পরবে আর কারা ছাড়বে—শুধু এই চিন্তা নিয়েই তো চার পাঁচটা মাস কেটে যায় প্রত্যেক বছর।

মোহনবাগানের জার্সির রঙ পছন্দ করেছিলেন ক্লাবের প্রথম সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ বসু; সঙ্গে ছিলেন নগেন সর্বাধিকারী আর মণিলাল সেন। অন্তত এই রকমই শোনা যায়। তারুণ্যের প্রতীক হিসেবেই বুঝি সবুজ, কিন্তু মেরুনটা কেন, তা বলতে পারার মত লোক, যত দূর জানি, আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু ইস্টবেংগলের জার্সি ঠিক করার ব্যাপারটা বেশ মজার। ক্লাব প্রতিষ্ঠার দু-এক দিন আগে হঠাৎ খেয়াল হল কার—জার্সি নেই তো! কী সর্বনাশ! "চলো চৌরংগীতে হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকানে। ওখানে হরেক রকমের জার্সি পাওয়া যায়। দেখে শুনে এমন এক সেট নিতে হবে যা দেখতে চমৎকার, পরতে আরাম ও আর-পাঁচটা জার্সির চাইতে একটু আলাদা।" বলে, চললেন সম্পাদক টাংগাইলের নগরকুলের জমিদার সুরেশ চৌধুরী তাঁর রোলস রয়েসে। সঙ্গে ছিলেন সহকারী সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ (সম্পর্কে জ্যোতিষচন্দ্র গুহ মশায়ের আত্মীয়)। বহুক্ষণ কেটে গেল, জার্সি আর পছন্দ হয় না সুরেশবাবুর। অবশেষে এক সেট সিল্কের জার্সি পছন্দ হল, কিন্তু তার দাম সাংঘাতিক—আশি টাকা! তখনকার বাজারে পঁচিশ টাকাতেই এক সেট বেশ ভাল জার্সি পাওয়া যেত। কিন্তু জমিদার বলে কথা! পছন্দ হয়েছে যখন, তখন ঐ জার্সিই ইস্টবেংগল ক্লাবের হবে।

তবে সেদিন যে জার্সি চৌধুরী মশায়ের মনে ধরেছিল,, তার রঙে আজকের এই হলুদ ছিল না—ছিল ঘন কমলাটে হলুদ বা অ্যামবার। অ্যামবার রঙের কাপড় সব সময় পাওয়া যেত না বলে তার বদলে ওটা দাঁড়িয়েছে ফিকে সোনালী হলুদ। জার্সিতে আঁকা ক্লাব-প্রতীক—মশাল-ধরা হাত—জ্যোতিষবাবুর পরিকল্পনা। মানে এই ক্লাব ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক, বাহক। যেমন পাল-তোলা নৌকোকে মোহনবাগান ক্লাবের প্রতীক করা হয়েছে। হয়তো এদেশ নদীমাতৃক বলেই।

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

দুই জার্সির দুই নামজাদা খেলোয়াড়
চুনী গোস্বামী ও সুকুমার সমাজপতি

তোমাদের পাতা

ফুচ্‌কাওলা

ফুচকা খেতে কে না ভালবাসে! কলকাতার ফুচ্‌কা তো বিখ্যাত। এত জায়গায় ফুচ্‌কা খেলাম, কিন্তু কলকাতার ফুচ্‌কার মতো এত ভাল ফুচ্‌কা আর কোথাও খেলাম না। কেউ কলকাতার ফুচ্‌কাওলাদের মতো ফুচ্‌কা বানাক দেখি। আমি একজন ফুচ্‌কাওলার কথা জানি। তার কথাই আজ তোমাদের বলব।

কয়েক বছর আগের কথা। তখন আমি কলকাতায় থাকতাম। আমাদের পাড়ায় একটা ফুচ্‌কাওলা আসত। সে খুব ভাল ছিল। তার নাম ছিল গোপাল। সে যখন প্রথমদিন আমাদের পাড়ায় এল তখন তাকে আমার খুব-একটা পছন্দ হয়নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই তাকে আমার ভাল লাগতে লাগল। সে-ও আমাদের খুব ভালবাসত। সে এলেই আমরা তাকে ঘিরে দাঁড়াতাম। ফুচকাওলা আমাদের ফাউও দিত। এমনি করে আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন ফুচ্‌কাওলা এল না। তার পরের কয়েকদিনও সে আর এল না। আমরা সবাই ঠিক করলাম, সে এলে আমরা তার সঙ্গে কিছুতেই কথা বলব না। কিন্তু না, সে আর কোনোদিনও এল না।

শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে নন্দিনী রক্ষিত (বয়স ৭)

চিঠি চিঠি

আমি মাসিক আনন্দমেলা পড়ি, পড়তে খুব ভাল লাগে। আমি চিরঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হয়ে জানাচ্ছি যে, মাসিক আনন্দমেলাকে যদি পাক্ষিক করেন খুবই ভাল হয়। বিমল করের গল্প ছাপাবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মৌলীনাথ রায় (বয়স—১১)

আমি মাসিক আনন্দমেলার গ্রাহক। আনন্দমেলা আমার খুব ভাল লাগে। আমার বাবা গ্যাংটকে বদলি হয়ে এসেছেন। এখানে এসে আনন্দমেলা হাতে পেতে খুবই দেরি হয়ে যায়। আনন্দমেলা তিরিশ দিন অন্তর বার হয়, তাই পত্রিকা হাতে পেতে খুব দেরি হয়। পত্রিকাটি পাক্ষিক করলে খুব ভাল হয়।

দেবাশিস বিশ্বাস

ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষায়

ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষায়
বিদ্যুৎ চমকায়,
ক্ষণে ক্ষণে খুব জোরে
বাজ ঐ গরজায়।
রাস্তায় শুধু জল
জলে জলে জলাকার,
কার্নিশে ডাকে কাক
থাকি বসে জানালায়
খেলাধুলা হবে নাকো
ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষায়।

সারণী দত্ত (বয়স—১০)

পুলিশ

পুলিশ ভায়া ভীষণ ভালো
রংটা যে তার বেজায় কালো।
তারা তো সব চোর ধরে
চোরদের সব বেজায় মারে।
মারতে মারতে করল কাবু,
চোর বলে "আর করব না বাবু।"

সোমেন চৌধুরী (বয়স—৮)

দুই সঙ্গী

বনের রাজা সিংহ,
বনের রানী সিংহী।
দুজনেতে গল্প করে,
যেন দুই সঙ্গী।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (বয়স—৮)

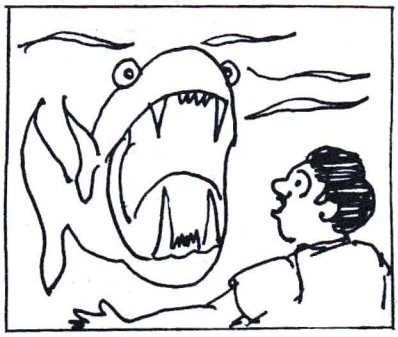

মাছের দেশে

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আমি তো অবাক! দেখি, ছোটকাকু আমার জন্মদিনে একটা একোয়ারিয়াম উপহার দিয়েছেন। কোনো-রকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি একছুটে একোয়ারিয়ামের সামনে হাজির হলাম। কতরকমের লাল নীল মাছ ওখানে খেলা করছে। একটা চীনে মাটির ব্যাঙ খালি মুখ বুজছে আর খুলছে। মাছগুলো ওর পেটের ভেতর থেকে কেঁচো মুখে নিয়ে উঠে আসছে। দুটো মাটির তৈরি গণ্ডার আর ইঁদুরও আছে। হঠাৎ দেখি নীল রংয়ের একটা বিরাট মাছ হাঁ করে খেতে আসছে আমাকে। আমি একটা গাছের পেছনে লুকোলাম। মাছটা গাছের ধার দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। তখন আমি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এক জায়গায় দুটো গণ্ডার জল খাচ্ছিল, আমাকে দেখেই তারা ছুটে এল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ মায়ের ডাক শোনা গেল, "খোকা, একোয়ারিয়ামের সামনে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস কেন? আয়, খাবি আয়।" ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে দেখি মাছগুলো আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে আর বলছে, 'কেমন মজা! খুব বোকা বানিয়েছি তো।'

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স—১০)

আমার প্রজাপতি

আমি প্রজাপতি ভীষণ ভালবাসি। একদিন একটি শুঁয়োপোকা এনে জুতোর বাক্সে রেখে-ছিলাম। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে কচি-কচি পাতা ওকে খেতে দিতাম। একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি পোকাটা প্রজাপতি হয়ে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নানা রঙের প্রজা-পতিটাকে আমি দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ প্রজাপতিটা উড়ে গেল পুতুলদের বাগানে। আমার দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

পূর্বা ভট্টাচার্য (বয়স—৭)

চিল

চিলরা উড়ে যায় আকাশে আকাশে,
ভেসে যায় তারা বাতাসে বাতাসে।
কেমনে তারা ওড়ে,
তাই ত ভাবি মনে।
ভেবে ভেবে হই সারা,
রাতে কেমনে থাকে তারা
তাই ত ভাবি মনে,
কেন যায় না তারা বনে।

রীণা ঘোষ (বয়স—৯)

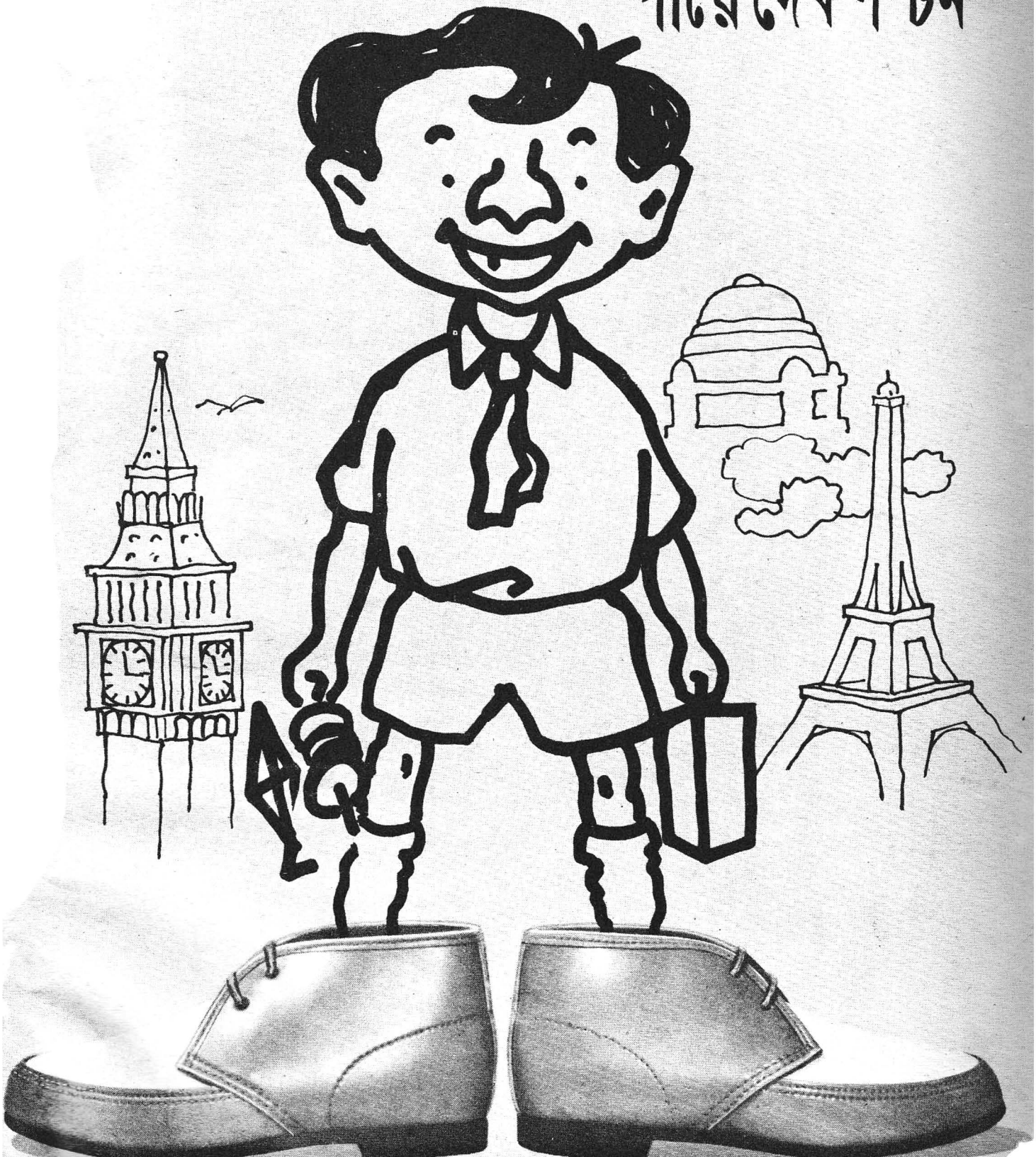

Bata
দিল্লী প্যারিস লণ্ডন
পায়ে দেব পল্টন
যেমনি মজবুত, তেমনি টেঁকসই আড়াই থেকে পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চাদের বহুৎআচ্ছা।
পল্টন ৪২, সাইজ ৩—৮, দাম ১৪ টাঃ ৯৫ পয়সা

ANANDAMELA Regd. No. WB|CC 264

আনন্দমেলা। দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। কার্তিক, ১৩৮৩। দেড় টাকা

সুরজিৎ সেনগুপ্ত
ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ